মনু মহম্মদ হিটলার

আজিজুল হক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লেখক নয়, লেখা পরিচিতি

কবি একবার বলেছিলেন, "বাজারে ফজলি আম উঠে গেলে কে আর ল্যাংড়ার খোঁজ করে, লোকে তখন আনারস খোঁজে।" কবির সৌভাগ্য তিনি দেখে যেতে পারেন নি, একদল লোক কিন্তু তাঁদের চিন্তাশক্তিটাকে 'ঠাণ্ডা ঘরে' জমা করে রাখেন এবং 'অসময়ের ফসল' হিসাবে মাঝে মাঝে তা বাজারে ছেড়ে বাজার-ছাড়া দাম হেঁকে কিছু কামিয়ে নেন। 'সমাজতন্ত্র' একবার প্রতিষ্ঠা পাবার পরও (যদিও অন্তর্ঘাত এবং কিছু ভ্রান্তিতে সেটা ধাক্কা খেয়েছে) তাঁরা খোঁজেন আদিম প্রতিযোগিতামূলক বাজার অর্থনীতি। মার্ক্স, পাভলভ, ফ্রয়েড-এর পরও তাঁরা স্লোগান তোলেন, "ফির রাম সে"। রামরাজ্যের মডেল গড়তে গিয়ে নিম্নবর্ণী মহিলা প্রকাশ কাউর-কে তাঁর নাবালক পুত্রের 'সতী-দেবী-'কে স্পর্শ দোষে-দুষ্ট করার অপরাধে মৃত্যুবরণ করতে হয়। রাজস্থানের ৪৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস, তাতে মুণ্ডিত মস্তক উলঙ্গ প্রকাশ দেবী-কে গাধার পিঠে বসিয়ে বাজারে ঘোরানোর সময় অত্যাচারে বিধ্বস্ত প্রকাশ অর্ধচেতন অবস্থায় জল চাইলে কেরোসিন মেশানো গরম জল তাঁর গলায় ঢেলে দেওয়া হয়, তিনি মারা যান। পাশের রাষ্ট্র 'বাংলা দেশে' এক তরুণীকে স্ত্রীশিক্ষা প্রচারের অভিযোগে 'শরিয়ত ভঙ্গকারী' হিসাবে প্রকাশ্য রাস্তায় চাবকানো হয়। খোদ আমেরিকার পাঠ্যপুস্তকে প্রকৃতি পরিচয় ঘটাতে গিয়ে লিখতে হচ্ছে, "যদিও এটা ঠিক আমাদের পবিত্র বাইবেলে বলা হয়েছে সূর্যটা পৃথিবীর চারদিকে ঘোরে, প্রভুর ইচ্ছাতে দিন রাত্রির সৃষ্টি, তবুও বাস্তব সুবিধের জন্য আমরা মনে করি পৃথিবীটাই সূর্যের চারদিকে ঘোরে এবং তার ফলেই দিন, রাত্রি এবং ঋতুপরিবর্তন ...." ধর্মের নামে বস্তুবাদকে নামিয়ে আনা হয়েছে ইতর বাস্তব বাদে। 'যুক্তিবাদ' দিয়ে প্রয়োগবাদের তাৎক্ষণিক বাস্তবতার স্বার্থে আত্মসম্ভোগ আমদানী হয়। 'বাম' দিক থেকে ধর্মকে বাঁচিয়ে রাখে 'যুক্তিবাবা'-রা।

মোদ্দা কথায় মানুষের প্রয়োজন ধর্ম নয়, মানবিক-গুণ, যেটা প্রজাতি হিসাবেই মানুষের আছে। প্রজাতি হিসাবে প্রকৃতিতে মানুষ অনন্য শুধু তার চিন্তাশক্তি আর সৃজনশীলতার জন্যই নয়, মানুষ অনন্য তার স্বাতন্ত্র্যর জন্যও বটে। একজন মানুষ অন্যজন অপেক্ষা ভিন্ন। এই স্বতন্ত্র মানুষ বিরুদ্ধ পরিবেশ এবং প্রকৃতির সামনে বোধ করে অসহায়তা। সেখান থেকে জন্ম নেয় প্রজাতি বিলুপ্তির আশংকা। এই আশংকার জন্যই তার প্রয়োজন হয় আত্মসমীকরণের। অন্যের সঙ্গে সমীকৃত হয় সে। তাই মানুষ সামাজিক জীবও বটে। ধর্ম, জাতীয়তাবাদ প্রভৃতি বস্তুগুলো এই আত্মসমীকরণেই গণ্ডগোল ঘটিয়ে দেয়।

বিশেষ সময়ে ধর্মকে ভালো কাজে ব্যবহারের নিদর্শন অনেকে তুলতে পারেন। এটা দিয়ে ধর্মের প্রগতিশীলতার ব্যাখ্যা হতে পারে না। বড়লোকের ভোজবাড়ির আস্তাকুঁড়ে কি আর দু-চারটে মিঠাই মণ্ডা পাওয়া যায় না? প্রকৃতপক্ষে ব্যক্তিগত সম্পত্তির এবং প্রভুত্বকামিতার নৈতিক যুক্তিই হল ধর্ম আবার এগুলোর সর্বোচ্চ সাংগঠনিক রূপ হল ফ্যাসিবাদ। তাই ফ্যাসিবাদের উৎসই হল ধর্ম এবং সেই কারণেই মনু, মহম্মদ আর হিটলার একই ভাষাতে কথা বলে।

ধর্ম মানেই আতঙ্ক, ধর্ম মানেই তোষামোদ করে কিছু পাওয়ার ধান্দা। ধর্ম মানেই দুর্নীতি। তাই ধরতে হবে ধর্মকেই। ..... রোগের লক্ষণগুলোর বিরুদ্ধে আস্ফালন না করে, রোগটার বিরুদ্ধেই ঘোষণা করতে হবে জেহাদ ..... তত্ত্বকথা কম বলে তীক্ষ্ণযুক্তি দিয়ে পরিবর্তনের জন্যই করতে হবে ব্যাখ্যা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মনু মহম্মদ হিটলার

আজিজুল হক

স্বতন্ত্র প্রকাশনী
৬৩ডি সেলিমপুর লেন, কলিকাতা ৭০০ ০৩১

প্রাপ্তিস্থান

দে বুক স্টোর্স
১২ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট

বইপাড়া
কলিকাতা ৭০০০৭৩

নাথ ব্রাদার্স
৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রথম প্রকাশ
উল্টোরথ, ১৪০১
পঁচিশ টাকা

আজিজুল হক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

অক্ষর বিন্যাস
ওয়েভ - ও - প্রিন্ট
৭৬ মহারাজা ঠাকুর রোড
কলিকাতা-৭০০ ০৩১

প্রচ্ছদপট-অঙ্কন পরিকল্পনা
পৃথ্বীশ গঙ্গোপাধ্যায়
তরুণ চক্রবর্তী

মুদ্রণ
অটোটাইপ
১৫২ মানিকতলা মেন রোড
কলিকাতা ৭০০ ০৫৪

প্রচ্ছদপট-মুদ্রণ
ক্লাসিক এন্টারপ্রাইজ
৬৬ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট
কলিকাতা ৭০০ ০০৯

বাঁধাই
বেঙ্গল বাইণ্ডার্স
৭২ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট
কলিকাতা ৭০০ ০০৯

কাগজ-সরবরাহ
পেপার অ্যাণ্ড স্টেশনার্স
২৪/১ বেনিয়াটোলা স্ট্রীট
কলিকাতা ৭০০ ০০৫

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উৎসর্গ

যে শিল্পী বলতে পারে
'পাল্টে দেবার স্বপ্ন আমার
এখনও গেল না' সেই
স্বপ্ন - সঞ্চারী সুমনকে .....
দীর্ঘ দীর্ঘ দিন সে বেঁচে থাক!

আজিজুল হক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সূচীপত্র

প্রথম পরিচ্ছেদ
১। সীমা থেকে অসীমে ১ - ১৮
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
২। ফ্যাসিবাদের উৎস সন্ধানে - হিন্দু ধর্ম ১৯ - ২৮
তৃতীয় পরিচ্ছেদ
৩। ফ্যাসিবাদের উৎস সন্ধানে - ইসলাম ধর্ম ২৯ - ৪০
চতুর্থ পরিচ্ছেদ
৪। মনু, মহম্মদ, হিটলার ৪১ - ৫৭
পঞ্চম পরিচ্ছেদ
৫। যুগের মড়ক তাই পুনরভ্যুত্থান ৫৮ - ৭৬

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যাদের থেকে 'চুরি' করেছি :-

১। মনুসংহিতা (সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদ)
২। কোরান (ইসলাম প্রচার সমিতি)
৩। হাদিশ (হরফ-বাংলা)
৪। মার্ক্স-এঙ্গেলস
৫। জর্জ থমসন
৬। কডওয়েল
৭। রাসেল
৮। নীৎসে
৯। দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়
১০। ডঃ ধীরেন গঙ্গোপাধ্যায়
১১। বিপান চন্দ্র
১২। রোমিলা থাপার
১৩। আই-পি-পাভলভ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রথম পরিচ্ছেদ

'সীমা থেকে অসীমে'

এক

'দুঃসাহসী বিন্দু আমি বুকে বহি সিন্ধুর চেতনা..... '—সরোজ দত্ত

পণ্ডিতদের সব-ই ভালো, সবই গুণ, কোন খারাপ তাঁদের ছুঁতে পারে না, কোন দোষ তাঁদের নেই। দোষ শুধু একটাই, তাঁরা মূর্খ। ঝঞ্ঝা বিক্ষুব্ধ সমুদ্রে তরীতে অধিষ্ঠিত পণ্ডিত যখন মূর্খ 'কাণ্ডারী'র কাছে সৃষ্টিরহস্য ব্যাখ্যা করতে ব্যস্ত, 'কাণ্ডারী' তখন সাঁতারের জন্য প্রস্তুতি নেয়। 'তরী' থেকে সে তীরে পৌঁছে যায়। পণ্ডিতের সামান্য মূর্খামি তাঁকে হাবু-ডুবু খাইয়ে অতলে (না কি রসাতলে) পৌঁছে দেয়। ধর্মেরও সব ভালো, সব-ই গুণ, খারাপ তাকে ছুঁতে পারে না, দোষ শুধু একটাই, মানুষ-কে সে মনুষ্যেতর জীবে পরিণত করে অসহায় করে দেয়। না হ'লে ডাক্তার হাজরা সাঁপুই, কিম্বা হৃদ্‌রোগ-বিশেষজ্ঞ একজন ডাক্তার কেন রুগী দেখার আগে কালী-মূর্তিতে ফুল চড়ায়?

ডাক্তার হাজরা সাঁপুই-কে আমি চিনতাম। মধ্যের দশকের শেষ ভাগে জঙ্গী ছাত্র আন্দোলনের কর্মী ছিলেন। ছাত্রজীবনে মনের ঠাকুর-কে স-আসন পুকুরে বিসর্জন দিয়েছিলেন। এ-হেন হাজরা বাবু, মধ্যবয়সে হঠাৎ কালী-ভক্ত হয়ে উঠলেন কেন জানার কৌতূহল ছিল। স্বাস্থ্য-দপ্তরের দাঁবারি ধরনের আমলা। সরাসরি তাঁকেই পাকড়াও করলাম। একটা জেলার প্রধান স্বাস্থ্য-আধিকারিক। তাঁর ভাষাতেই—'বেশ চলছিল বুঝলেন। ভগবান ছিলেন ভগবানের জায়গাতেই। তাঁকে ছাড়াই আমি এক পুত্র, এক কন্যা, বৃদ্ধা মা, স্ত্রী নিয়ে দিব্যি চালিয়ে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ তাঁর মনে হল এই ব্যাটা হাজরা সাঁপুই-এর পূজো না পেলে চলবে না। পর পর মৃত্যু। মা গেলেন। বয়স হয়েছিল .....। মেনে নিলাম। বলা নেই, কওয়া নেই তিনদিনের জ্বরে তরতাজা ছেলেটা চোখের ওপর মরে গেল। তার ডাক্তার বাবা অসহায় ভাবে দেখলো, বিজ্ঞান কত অসহায়।' বলতে বলতে ডাক্তার পিতার চোখ চিক চিক করে। আমি চুপ করে থাকি। 'ছেলেকে পুড়িয়ে এসে, মুখ থেকে শুধু একটাই কথা বেরুলো, "ভগবান, তুমি এ কী করলে!" নিজেই চমকে উঠলাম।' আবার তিনি থেমে গেলেন। কিছুক্ষণ পরে নিজের টেবিলের ড্রয়ার থেকে একটা অ্যালবাম বার করে দেখিয়ে বলতে থাকেন, 'এই যে দশ বছরের খোকা। এটাই শেষ ছবি।' ছবিটার ওপরে দু-ফোঁটা চোখের জল পড়ে। পকেট থেকে পরিষ্কার রুমাল বার করে আস্তে আস্তে জলটা 'শোক' করান। যুক্তিহীন পরিণতির যুক্তি ভগবানকে সৃষ্টি করলেন ডাকসাইটে সার্জন। 'আমি তো তবু এ-কাজ সে-কাজ নিয়ে থাকি। কতটুকুই বা সময় পাই মৃতের জন্য শোক করার। কিন্তু আপনার বৌদি? যে দিকে তাকায় খোকার দৌরাত্ম্য স্মারক। আলমারির ভাঙা কাঁচ, দেওয়ালে কাঠ

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কয়লার আঁকা ছবি, জানালাতে রঙ চটিয়ে রঙ করার প্রচেষ্টা.....সে তো এগুলো দেখে আর গুমরাতে থাকে। কাঁদতেও পারে না। ঘরের কিছুতেই হাত দিতে দেয় না। দেওয়ালটা নোংরা দেখাচ্ছে হয়তো মুছতে গেছি, অমনি 'হাঁ, হাঁ' করে তেড়ে আসে। মুছবে না, ওটা এঁকেছিল বলে সেদিন তাকে কত বকলাম কান ধরে.....।' আর বলতে পারেন না ডাঃ সাঁপুই। কিছুক্ষণ পরে..... 'ওষুধ দিই খেতে চায় না। একদিন খাওয়া-দাওয়া বন্ধই করে দিলো। উন্মাদ হয়ে গেল সে। ছোট সাত বছরের মেয়ে। বাইরে কাজ। গ্রামে গ্রামে স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলো তৈরি হচ্ছে তখন। কোন না কোন গ্রামে যেতে হচ্ছে প্রতিদিন। সারাদিনের ক্লান্তি নিয়ে বাড়ি ফিরি আমি; কাঁদতেও পারি না, শোক আমার কাছে বিলাসিতা। শান্ত হয়ে শুতে যাবার সময় বুক চিরে হাহাকার.....'ঠাকুর তুমি বলে দাও আমি কী করবো?' ডাক্তারের কথা শুনতে শুনতে বুকের ভেতরটা মোচড় দিয়ে ওঠে। মানুষ সীমাবদ্ধ জীব। যত বড় চিন্তাশীলই হোন না কেন, তাঁর জ্ঞান সময় সুযোগ পরিবেশ দ্বারা সীমাবদ্ধ। অনেক কিছুই তার অজানা। অজ্ঞাত বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের কণামাত্র তার আয়ত্তে। এটাকে স্বীকৃতি দিতে না পারাটা যে কত বড় মূর্খামি! এই 'অজানা'টা বা 'অজ্ঞাত'-টা কে মানুষ মানতে পারে না। তাই একদল ছুটে চলে 'সীমা'র থেকে সীমানা ভেঙ্গে 'অসীমে'। এ-যেন অঙ্কের সেই খেলা—এক্স টেন্ডস টু ইনফিনিটি। 'জানা'র ঝোঁক 'অসীম'-এর দিকে। সে ছুটছে। ছুটছে বলেই আজকের 'অজ্ঞাত'-টা কালকে 'জ্ঞাত' হয়ে যায়। 'অজানা'-টা 'জানা' হয়ে যায়। আজকের অনিবার্য বলে চিহ্নিত ব্যাপারগুলো তার আয়ত্তে আসে। অনিবার্যতার রাজত্ব থেকে স্বাধীনতার রাজত্বে প্রবেশ করে সে। 'অজ্ঞাত'-টা 'অজ্ঞাত'-ই থেকে যাবে এ চিন্তা দূর হবে। সব ব্যাখ্যা, সব জানা, একই সঙ্গে একই সময়ে যদি মানুষ করে ফেলতে পারে তা হলে তো মানুষের বিকাশ-ই স্তব্ধ হয়ে যাবে। মানুষ বলে কোন কার্যকরী চিন্তাশীল প্রাণীই পৃথিবীতে থাকবে না। থাকবে একটা জড়দ্গব জীব। 'অজ্ঞাত'-টা 'জ্ঞাত' হবে। 'জ্ঞাত'-টা বিকশিত হয়ে নতুন নতুন ভাবে উপস্থাপিত হয়ে সেটাকে অজ্ঞাত করে দেবে। 'না' থেকে 'হ্যাঁ'-তে পৌঁছানো-ই তো মানুষের কাজ! এখানে অতিপ্রাকৃতিক কিছুই নেই। জানা বস্তুটাও প্রকৃতির, প্রকৃতির নিয়মেই সেগুলোর গতির মধ্যে বিনাশ হয়ে নতুন বস্তুতে রূপান্তরিত হয়ে 'হ্যাঁ'-তে পরিণত হবে। কিম্বা বিলীন হয়ে যাবে।

ডাক্তার হাজরা সাঁপুই ব্যাখ্যা চান, সীমাবদ্ধতা তাঁকে সেখানে পৌঁছোতে দেয়নি। তিনি আর দৌড়ুতে পারলেন না। 'কারণ,' ডাক্তার সাঁপুই একটা গ্লাসে তরল পানীয় ঢেলে শুরু করেন,..... 'কিছু মনে করবেন না, সারাদিন পরে ঘরে ঢুকলে ঘরটা গ্রাস করতে আসে।' আমি একটু হাসি। 'এমন সময় হঠাৎ ওপর থেকে অর্ডার! বদলি! নির্দিষ্ট কাজ করতে গাফিলতি হচ্ছিল ঠিক-ই। কিন্তু কর্তাদের তো সব জানিয়েছি আমি। ওঁরা কেউ বুঝলেন না! অদ্ভুত হৃদয়হীন! কী আর করবো, সব গুছিয়ে

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খোকার স্মারক, মায়ের স্মৃতি সব সেখানে ফেলে রেখে বাঁধা-ছাদা করতে শুরু করলাম।'..... পরপর কয়েক গ্লাস খেয়ে টেবিলে দুই হাতে মাথা গুঁজে পড়ে রইলেন ডা: সাঁপুই, সেদিন শুধু তাঁর মুখ দিয়ে একটাই কথা বেরিয়েছিল: 'ভগবান এই কী তোমার বিচার?'

বেশ কিছুক্ষণ বসে থেকে যখন বুঝলাম ডাক্তার সাঁপুই আজ আর মাথা তুলবেন না, তাঁরই প্যাডে লিখলাম: "ডাক্তার/যুক্তিহীনের যুক্তি, হৃদয়হীন সমাজের হৃদয় (সান্ত্বনা)/ভারবাহী পশুর বুক চেরা ক্লান্ত শ্বাস ধর্ম (ভগবান)। ধর্ম আফিম। ঝিম পাড়িয়ে দেয়। অনিবার্যতার রাজত্বকে স্বীকার করতে বাধ্য করায়। যুক্তি খুঁজতে দেয় না। অনিবার্যতার রাজত্ব থেকে স্বাধীনতার রাজত্বে প্রবেশে বাধা দেয়। আতংকিত জীবদের দাসমনোভাবাপন্ন করে তোলে। হৃদয়হীনদের কলজেটাকে উপড়ে নিতে বাধা দেয় ধর্ম। তোমার হাতে তুলে দেয় মদের বোতল; তুমি ঝিমুতে থাকো।"

ডাঃ সেনের কথা

ডাক্তার সেনের ব্যাপারটা কিন্তু আর এক ধরনের,.....। "বুঝলেন, হৃদ্‌রোগে তখন সাকসেস-রেট খুবই কম। রুগী আসে আর মরে। কারণ দুটোঃ প্রথমত, এ-ডাক্তার সে-ডাক্তার, বাবার-থান, মায়ের-থান করে তারা শেষে আসে, বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই কিছুই করার থাকে না। দ্বিতীয়ত একটা হৃদ্‌রোগীর সেবা এবং পথ্যের সচেতনতার অভাব। না খেয়ে মরার উপক্রম। 'বল যা তারা' বলে তারা-মা-কেই সম্বল করি। একই সঙ্গে 'মায়ের থান', এবং ওষুধ। রুগী দেখি, ওষুধ দিই। রুগীদের বলে দিই 'মরা বাঁচা সব তাঁরই হাত। তারা-মা'র ইচ্ছা। আমি নিমিত্ত মাত্র। রুগীগুলো ভরসা পায়। এতে দুটো লাভ হল আমার। রুগীর পরিবারের এবং রুগীর আস্থা বাড়ে। দ্বিতীয় লাভ-টা ব্যবসায়িক, মরলে তারা-মা'র কৃপা, ডাক্তার কী করবে। বাঁচলে ডাক্তারের হাত-যশ। সাক্ষাৎ দেবতা।"

ডাক্তার সেনের সঙ্গে কথা বলে সেদিন চলে এসেছিলাম। ধর্মকে সামনে রেখে ডাক্তার সেন বিজ্ঞানকে বিকৃত করে তুলেছেন। বেড়ে চলছে তাঁর ব্যবসা। ধর্মের সঙ্গে সম্পত্তি এবং ব্যবসা বৃদ্ধির সম্পর্ক।

অথ পবন, সূর্যদেব কথা

শীতে কাঁপতে কাঁপতে চাদর গায়ে এক পথিক চলেছেন। তাঁকে দেখে, পবনদেব সূর্যকে চ্যালেঞ্জ জানায়, 'ওহে সূর্য, লোকে তো তোমাকে জানে মহাশক্তিধর, এসো, প্রমাণ হয়ে যাক, কে বড়? কে প্রকৃত শক্তিধর!'

সূর্যদেব বিনয়ের সঙ্গে বলে, 'পবন, তুমিই বড়, তুমিই শক্তির আধার। লোকে ভুল বলে।'

পবনদেব তাঁকে ব্যঙ্গ করেন 'তুমি ভয় পাচ্ছো? খুলে ফেলো তো দেখি ঐ পথিকের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চাদর!'

সূর্যদেব আবার হাসেন, 'পবন, এ সবের প্রয়োজন কি? আমি তো বলছি-ই তুমি শক্তিধর!

'ওসব ছেঁদো কথা ছাড়ো, চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করো!' পবনদেবের উত্তর।

'তবে তাই হোক! পিতামহ ব্রহ্মাকে ডাকো, তিনি-ই আম্পায়ার হবেন।' সূর্যদেবের কথা মতো ব্রহ্মা আসরে এলেন। টস হল। ব্রহ্মা প্রথমে পবনকে ডাকলেন, 'তোমাকে পনের মিনিট সময় দেওয়া হল, লোকটাকে না মেরে, তুমি ওর চাদরটা খুলে ফেল।'

হঠাৎ জোরে জোরে বাতাস বইতে শুরু করে। শীতার্ত পথিক হতভম্ব। একটু থমকে আকাশের দিকে তাকায়। 'এ কী রে বাবা! মাঘমাসে কাল-বৈশাখী! ঠাণ্ডাটা ধরিয়েই ছাড়বে দেখছি।' বাইরের ঠাণ্ডার হাত থেকে বাঁচার জন্যে পথিক চাদরটা আরও সাপটে জড়িয়ে নেয়। শন, শন বাতাস থেকে শোঁ শোঁ ঝড়.....ঝড় যত বেগবতী হয় পথিক ততই চাদরটা আঁকড়ে ধরে। পনের মিনিট পর ব্রহ্মা পবনকে থামার নির্দেশ দিলেন।

তারপর ব্রহ্মা সূর্যকে ডাকলেন। স্রষ্টাকে প্রণাম জানিয়ে সূর্য আকাশের ময়দানে নামে। আকাশ পরিষ্কার হচ্ছে দেখে পথিক স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে। সূর্য বাড়তে থাকে। পথিক ভেতর থেকে উত্তপ্ত হয়। চাদরটা আলগা করে দেয়। পাঁচ সাত মিনিট পর তাঁর বেশ গরম লাগে অবশেষে তিনি চাদরটা খুলে ফেলেন।

প্রকৃতির সঙ্গে নিজের সম্পর্ক বুঝতে না পেরে, অস্তিত্বের বিপন্নতার আশংকায় ধর্মের যে আলখাল্লাটা গায়ে জড়িয়ে মানুষ বাঁচতে চাইছে ঝড় তুলে সেটা কী খোলা যাবে? যে প্রয়োজনে তাকে এই আলখাল্লা চাপাতে হয়েছে, সেই প্রয়োজনটা দূর হলে ভেতরের গরমে সে নিজেই ওটা খুলে ফেলবে। তখন ডাঃ সেন যতই চেষ্টা করুক কালী আর বিজ্ঞানকে পাঞ্চ করে চালাতে পারবে না।

AMARBOI.COM

প্রথম কথাটা প্রথমে

এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড কী করে এসেছে? পৃথিবী কে সৃষ্টি করেছে? খোদা, না ব্রহ্মা, নাকি 'অল মাইটি ক্রিয়েটর?' এটা যদি ঠিক হয়ে যায় তাহলেই পরের প্রশ্নটা হবে, 'তাদের স্রষ্টা কে?' ধর্মে সে প্রশ্ন করা নিষিদ্ধ। কিম্বা খুব যুক্তিবাদী ধর্মবিশ্বাসী হলে বলবে, 'তিনি স্বয়ম্ভূ।' তাহলে প্রশ্ন আসবে 'স্বয়ম্ভূ' আত্মপ্রকাশ করে খেয়াল বশতঃ এই মহাবিশ্ব সৃষ্টির আগে, তিনি কী আকারে বা 'ফরমে' ছিলেন? তরল, বায়বীয়, না কঠিন? উত্তর মেলে না। তাই সব ধর্মেই প্রথমেই নির্দেশ করা হয়েছে 'মহাবিশ্ব কে সৃষ্টি করেছে? এ প্রশ্ন কোরো না। তাহ'লেই প্রশ্ন এসে যাবে সেই স্রষ্টার উৎস কি?' 'ভগবান' যদি কোন কিছু 'না' থেকে 'হাঁ' হতে পারে, তাহলে এই মহাবিশ্বটাই বা হবে না কেন? ইত্যাদি ইত্যাদি.....। তখন ধর্মের সামনে একটাই পথ খোলা থাকে তিনি একটা 'শক্তি' (ওঁম, ব্যোম) অথবা 'নূর' (জ্যোতি)। এটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হলে তো ল্যাটা চুকেই যায়। 'শক্তি' বা নূর'-ই যখন, তখন সেটা তো একেবারেই প্রাকৃতিক ব্যাপার, ইংরেজিতে বললে যাকে বলা হয় 'ভেরি মাচ মেটিরিয়াল অ্যাণ্ড ন্যাচারাল।' এমনিভাবে দেখলে, 'ধর্ম' নিজেই যে 'অতিপ্রাকৃতিক' শক্তির কথা বলে, শক্তির অস্তিত্বের মধ্য দিয়েই সেটা নাকচ করে দেয়। ভগবান বা খোদার অস্তিত্ব স্বীকৃতির মধ্যেই ধর্মের জন্ম। আর ভগবান বা খোদার জন্মটাই গোলমেলে ব্যাপার। আর গোলমেলে একটা শক্তি-কে আত্মপ্রতিষ্ঠা করতে হলে যুক্তির চেয়ে বেশী নির্ভর করতে হয় 'অজ্ঞতা', 'ভয়', এবং 'বিশ্বাসের' ওপর। এগুলোর মধ্যে আবার 'ভয়'টাই তাদের প্রধান ভরসা।

আগেই বলেছি, 'সময় পরিবেশ সুযোগ এবং বংশ-গতির দ্বারা' মানুষ সীমাবদ্ধ। তার জ্ঞানও সীমাবদ্ধ। সর্বজ্ঞ মানুষ বলে কোন বস্তু হয় না। এই সীমাবদ্ধতাটাই, মানুষের বিকাশের চালিকাশক্তি। মানুষের সাময়িক 'না-জানার', 'না-ব্যাখ্যা' করতে পারার সুযোগটা ধর্ম গ্রহণ করে। সেখানেই তার কারবার। 'ভয়ে'র সুযোগে আতঙ্ক সৃষ্টি করে মানুষকে 'বিশ্বাসী' করে তোলাটাই ধর্মের মূল কাজ। তাই ধর্ম মানেই আতঙ্কবাদ। প্রত্যেকটা ধর্মীয় সংগঠনের আতঙ্কবাদী চরিত্রের উৎসটাই এখানে। শুধু, জামায়েত, আর. এস. এস-ই নয়, খৃষ্টান মিশনারিরাও একই কাজ করে। তাই বর্তমান বিশ্বের সব চেয়ে বড় আতঙ্কবাদী মতবাদের নাম 'ধর্ম'। আতঙ্কবাদী সংগঠনের নাম ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান তা-সে রাজনৈতিক-ই হোক, আর মৌলবাদমূলকই হোক! কেউ সরাসরি খুন করার হুমকি দিয়ে আতঙ্কের আবহাওয়াটা জিয়ায় রাখে। কেউ বা আবার মানসিকভাবে আতঙ্কিত করে রাখে।

AMARBOI.COM

মানুষের জন্ম এবং ধর্ম

এই 'ভয়' আবার নানান ধরনের এবং সর্বব্যাপী। যার সম্পত্তি আছে তার সম্পত্তিনাশের ভয়, যার নেই, তার সম্পত্তিহীনতার জন্য দারিদ্র্যের ভয়। যার সম্মান আছে তার সম্মানহানির ভয়, যার সম্মান নেই তার অবমাননার ভয়। যার প্রতিষ্ঠা আছে প্রতিষ্ঠা হারানোর ভয়, অভাবে লাঞ্ছনার ভয়। এসব-কিছুর উর্ধ্বে আছে মৃত্যুভয়। এখান থেকেই আসে মরার পর বেঁচে থাকার ধান্দা। এই ভয় থেকেই আসে 'পাপ' বোধ এবং অন্য-দুনিয়ার বা মরণোত্তর জীবন এবং জগতের চিন্তা। সুতরাং এই 'পাপ' বা 'গোনাহ্' বোধটা ধর্ম সৃষ্টি করে থাকে মানুষের জন্ম সম্বন্ধে রহস্যের জাল বিছিয়ে। তারা প্রথমেই বোঝাতে চেষ্টা করে মানুষ 'পাপের ফসল।' ঈশ্বর তাঁদের পৃথিবীতে পাঠিয়েছে তার সেই 'জন্ম-টাকে শুদ্ধ করে নেবার জন্য।' পৃথিবী যেন একটা পাতন-যন্ত্র, এখানে ভেজাল (পাপ) মানুষ দুঃখ, কষ্ট, মরণের মধ্য দিয়ে বিশুদ্ধ হবে যেমন ভাবে জল পরিশোধিত হয়।

সুর আর অসুররা একই সঙ্গে সমুদ্র মন্থন করে অমৃতভাণ্ড তো তুললো। অসুরদের ফাঁকি দিয়ে সুর-রা বা দেবতারা সেই অমৃত পান করে উদ্দাম হয়ে ওঠে। সেই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উদ্দাম মাতলামো জনিত যৌন উত্তেজনার ফলে যাদের জন্ম হয় তারই নাম মানুষ। দেবতাদের ব্যভিচারের এই ফসলকেই বলা হল 'অমৃতস্য পুত্রাঃ।' (পাছে তারা দেবত্ব চেয়ে বসে তাই আর কী! যেমন রাজ-পরিবারের ব্যভিচারে দাসী এবং প্রজাদের গর্ভজাত মানুষগুলোকে সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করার জন্য রাজবংশী খেতাব দিয়ে দেওয়া) কিম্বা, শয়তানের প্ররোচনায় নিক্ষিপ্ত হবার পর তাদের সন্তান 'সন্ততিরাই মানুষ।' 'হাওয়া' (বা ঈভ) দেবীর লোভজাত ফসল মানুষ।

সোজা কথায় 'পাপে'র ফসল, বা 'পাপজাত' বস্তুর ফসল বলেই মানুষ 'পাপী।' 'পাপে'র শাস্তিই মৃত্যু। এই মৃত্যুকে কেন্দ্র করেই তৈরি হয়েছে ধর্মের যত কারসাজি। এই 'পাপ'গুলোর মধ্যে সব চেয়ে বড় 'পাপ' হল বিদ্রোহ। হিন্দুদের কোডবিল মনু-সংহিতাই হোক আর মুসলমানদের কোরানই হোক, সর্বত্রই ছত্রে ছত্রে এই বিদ্রোহের বিরুদ্ধে শাস্তির হুমকি। হুমকি দিতে পারে কারা? যাদের হুমকি দেবার ক্ষমতা আছে এবং কিছু হারানোর ভয় আছে। হুমকি দেওয়া হয় কাদের? যাদের সেই হারাবার বস্তুগুলোর অধিকারী হবার সম্ভাবনা আছে। ব্যাপারটা কী রকম:

ভগবান বা খোদা নিজের সৃষ্টির দিকে তাকিয়ে হঠাৎ বিষাদগ্রস্ত হয়ে পড়েন। তখন তিনি কী করেন? আলো, বাতাস, জল সবই তো হলো। তবু কী যেন নেই। তিনি তাঁর শ্রেষ্ঠ উপাসক দেবদূতকে বললেন, 'এবার কিছু একটা করো যেটা অভিনব।' সে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড খুঁজে সর্বোৎকৃষ্ট শক্তি, পদার্থ এবং সম্পদ দিয়ে একটা মূর্তি তৈরি করলো। 'খোদা, বা অলমাইটি' মূর্তিটাকে দেখেই চমকে উঠলেন, 'বাঃ আমার সৃষ্টির মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট সৃষ্টি এটি।' কারিগর দেবদূত একটু অবাক-ই হয়। মুখে কিছু বলে না, সে ভাবে 'ভালো রে মজা! তৈরি করলাম আমি, আর সৃষ্টিটা কি না ওঁর।' অন্তর্যামী তার মনের কথা বুঝতে পারেন। মুচকি হেসে তার ঔদ্ধত্যের পরীক্ষা করার জন্য আদেশ করলেন, 'গতি (প্রাণ) সঞ্চারিত হোক', মূর্তিতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা পায়। তারপর খোদা দেবদূতকে আদেশ করেন, 'একে সিজদা (প্রণতি) করো। এর পায়ের কাছে মাথা নত করো!' এবার কারিগর বিদ্রোহ করে। 'না! এ অসম্ভব। নিজের হাতে আমি যাকে সৃষ্টি করেছি তার কাছে মাথা নোয়াতে পারবো না।' অন্যান্য দেবদূতরা অনেক বোঝালো। সে অনড়। তখন তারা এমন একটা ঘরে মূর্তিটাকে স্থাপন করলো, যেখানে ঢুকতে গেলেই মাথা নীচু করতে হয়। সব-দেবদূতরা কিছুতেই মানতে পারছে না, তাদের নেতা মালিকের কোপে পড়ুক। তাদের ইচ্ছা, নেতা ঐ ঘরে ঢুকতে গেলেই যেই মাথাটা নীচু হবে অমনি তারা মালিকের কাছে আর্জি জানাবে, 'হুজুর, নেতা তো মাথা নীচু করেছে, ওকে মার্জনা করুন।'

দেবদূত সহকর্মীদের এই দুর্বলতা বুঝতে পারে। তাই তারা যখন বলে, 'দেবদূত, তোমাকে 'সিজদা' করতে হবে না। তুমি শুধু ঐ ঘরে ঢুকে মূর্তিটা দেখে এসো।' সে হেসে বলে, 'তোমরা সুখে স্বর্গে থাকো। স্বর্গের দাস হয়ে থাকো। আমি নিজের

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সৃষ্টির কৃতিত্ব আয়েসী পরশ্রম-চোরা কাউকে দিতে পারবো না। আমি ওই মূর্তিটাকে সিজ্‌দা করতে পারি না।' ঐ কথা উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গেই সমগ্র স্বর্গ হায় হায় করে ওঠে। দেবদূতের ওপর নেমে আসে মালিকের কোপ। তার নাম হয় শয়তান। তাকে নরকে নিক্ষেপ করা হয়। সর্বশক্তিমানের কোপ মাথায় নিয়ে শয়তান হাসতে হাসতে সহকর্মীদের বলে, 'তোমরা স্বর্গের দাসত্ব করো, স্বর্গের দাসত্ব করার থেকে নরকের রাজা হয়ে থাকা অনেক শ্রেয়। সেখানে তো আর তোমাদের সর্বশক্তিমানের হুকুম তামিল করতে হবে না। বজ্র (অস্ত্র) শক্তির অধিকারী বলেই না সে সর্বশক্তিমান।' সুতরাং বিদ্রোহের অপর নাম নরকবাস। শক্তির উৎস বজ্র বা (অস্ত্র)। অস্ত্রের জোরেই বিদ্রোহীকে ঠাণ্ডা করা। তাজমহলের শিল্পীকে কে চেনে? উপকথাতে তো বলে তাকে হত্যা করা হয়। তাজমহলের শিল্পী কি তাঁর সৃষ্টিকে দিল্লীশ্বরের নামে চালানোর বিরোধিতা করতে পারে? পিরামিড কি দাসদের মেধা, শ্রম, কল্পনাশক্তির ইতিহাস নয়? অন্যদিকে অস্ত্রবলে বলীয়ানদের শ্রম-চুরির ইতিহাসও বটে!

তাহ'লে দেখা যাচ্ছে, কী সেমেটিক ধর্মগুলোতে, কী প্রাচীন ধর্মে, মানুষ শয়তানের সৃষ্টি, পাপের ফসল। তাই তো মানুষের এত কষ্ট, মৃত্যু, ধ্বংস ইত্যাদি। এর মধ্যে যারা একটু পুণ্যের অধিকারী তারাই সর্বসুখভোগী। তাই ধর্মের অন্তর্বস্তুটাই দেবতা, আর অজ্ঞতার ওপর প্রতিষ্ঠিত। এই আলখাল্লাটা যাতে খুলে না পড়ে তার জন্য ব্যবহার করা হয়েছে 'ভয়'কে। এই জগতে বাস্তব 'ভয়'। মরণোত্তরপর্বে নরকের 'ভয়', বংশ-বিনাশের ভয় ইত্যাদি গুলোই ধর্মের পুঁজি। আতঙ্ক রোগের রুগী (ফিয়ার সাইকোসিস) ছাড়া ধর্মপ্রাণ হওয়া যায় না। আর একজন আতঙ্কিত মানুষকে কোনক্রমেই 'স্বাধীন' মানুষ বলা যায় না। ভয়যুক্ত মানসিকতাটাই হল স্বাধীন মানুষের প্রথম শর্ত। যে শ্রমিক বা কর্মচারীকে অনবরত ভাবতে হয়, 'এটা করলে, আমার চাকরি চলে যাবে, ওটা বললে ছাঁটাই হয়ে যাবো, না খেয়ে মরতে হবে.....। তার পক্ষে কি মালিকের 'শ্রম-আত্মসাৎ' করার বিরোধিতা সম্ভব? সে কি স্বাধীন পদক্ষেপ নিতে পারে? ভয় থেকে মুক্তিটাই যে-কোন বিদ্রোহের প্রাথমিক শর্ত। অননুগামীদের ভীত সন্ত্রস্ত করে তোলা এবং অনুগামী হলে পুরস্কৃত হবার লোভে প্রলুব্ধ করা—এটাই 'ধর্ম' বা রিলিজিয়ন। ধর্মপুস্তকগুলোর ছত্রে ছত্রে এর নিদর্শন। বলা যেতে পারে মূল উপজীব্য।'

ভয় এবং লোভ-ই সমস্ত দুর্নীতির উৎস

'রূপং দেহি! যশো দেহি! ধনং দেহি!' দেবীর সামনে বসে শত্রুর বিনাশ কামনা করতে করতে মনের ইচ্ছার বহিঃপ্রকাশ, 'দাও, দাও, দাও, সব দাও! আমাকে রূপ দাও (তার মানে অন্যকে কুৎসিত করো, অন্যে কুৎসিত না হলে আমি যে রূপবান সেটা প্রমাণ হবে কি করে?) আমাকে যশ দাও। (অর্থাৎ সকলে যশোবান হলে আমি যে যশস্বী সেটা বুঝবে কে?) ধন দাও, (নির্ধন থাকুক, না হলে ধনের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আকাঙ্ক্ষা কেন?) আমার শত্রু বিনাশ করে দাও.....আমি তোমার পুজো করছি (মানে ভেট দিচ্ছি)।' ইসলাম ধর্ম সহ সমস্ত সেমিটিক ধর্মেও একই মোনাজাত (যাচঞা)। দু-হাত তুলে ভিক্ষা চাওয়া, 'দাও, দাও!' সুতরাং এর পরে যখন বলা হয় 'সর্বজনে মঙ্গল করো, সকলকে সুখে রাখো' সেটা হাস্যকর হয়ে যায় না কি? ধর্মের মূলরূপ বলে যেটা বলা হয়ে থাকে, 'সকলের মঙ্গল কামনা করা,' সেটা ভাঁওতা মাত্র। ধার্মিক যতই দাবী করুক। আসলে কিন্তু তার দাবী: 'মি ফার্স্ট'—'আমিই প্রথম দাবীদার', আত্মোন্নতি এবং আখের গোছানো। খুব বেশী উদার হলে বড় জোর সে বলতে পারে: সকলকে দাও, আমাকে একটু বেশী দাও। কারণ, রূপ, যশ, ধন এগুলো অন্য একটা দ্বিতীয় পক্ষের সঙ্গে তুলনাতেই বিচার করা হয়। সকলেই রূপবান, ধনবান, যশস্বী হলে কেউ-ই আসলে রূপবান, ধনবান বা যশস্বী নয়। তখন এই প্রার্থনাটা অবাস্তব। অর্থাৎ প্রণতি বা পূজা অথবা উপাসনাটা একেবারেই পার্থিবস্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যাপারের সঙ্গে জড়িত। তোষামোদ করে, কোপদৃষ্টি থেকে বাঁচা এবং কিছু হাসিল করা। তাই, 'ধর্ম' তোষামোদ, ঘুষ এবং কাজ হাসিল করার যুক্তি সরবরাহ করে। বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে তো একটা কথা চালু আছে: 'খোসামোদ মে খোদা রাজি' অর্থাৎ তোষামোদে ভগবানও সন্তুষ্ট।

অন্যদিকে, ভগবান, আল্লা, অলমাইটি গড, কিম্বা তাদের প্রতিকল্প, কালী, দুর্গা, কৃষ্ণ ব্রহ্মা সকলেই এই আত্মসমর্পণকারীকে অভয় দিয়ে বলছে: গো অ্যাহেড। তোমরা কিছুই করতে পারো না, সব-ই আমি করি, আমার জন্য (সত্যের নামে) যে-কোন কাজই ন্যায়। আমিই তোমাকে রক্ষা করবো। কৃষ্ণ অর্জুনকে বিশ্বরূপ দর্শন করিয়ে ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করে। যুধিষ্ঠিরকে মিথ্যা বলতে প্ররোচিত করে, শঠতাকে যুক্তিসিদ্ধ করে। সেখান থেকেই উদ্বুদ্ধ হয়ে ধর্মপ্রাণ অন্যায় করে এবং মনে করে তার দায় ভগবানের কাছে। 'পাপী' মানুষের কাছে নয়। সুতরাং সে হত্যা, ধ্বংস, অপচয়, সব কিছুকেই যুক্তি সিদ্ধ করতে পারে, গ্রহণযোগ্য এবং সহনীয় করে তুলতে পারে, সব দায়িত্ব তাঁর (ভগবানের) কাঁধে চাপিয়ে দিয়ে। ইসলাম, খ্রীষ্টান, সব ধর্মে-ই ধর্মপ্রাণদের সামাজিক অন্যায়ের নৈতিক যুক্তি সরবরাহ করে থাকে। 'তোমার কর্ম তুমি করো মা/লোকে বলে করি আমি' চমৎকার অজুহাত। একদিকে 'বিনয়ের আদর্শ, অন্যদিকে খুনের অজুহাত।' তাই দেখা গেছে। নিষ্ঠুর রাজা, পররাজ্য-গ্রাসী সম্রাট, থেকে শুরু করে হাড়ে মজ্জায় অপরাধী খুনী, বদমায়েস, জালিয়াতরা খুবই ধর্মপ্রাণ হয়ে থাকে। বিপরীত ক্রমে বলা যেতে পারে (দু-চারজন ব্যতিক্রমী সামাজিক দায়বদ্ধ ধার্মিক ব্যক্তি ছাড়া), সমস্ত ধর্মগুরু এবং উৎসাহী ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি উপরোক্তদের সব কাজের যুক্তি সরবরাহ করে থাকে।

সার-সংক্ষেপ: ধর্মের আবির্ভাবের সময়কাল

তাহলে দেখা যাচ্ছে ধর্মের জগৎ হল এমন একটা জগৎ যেখানে মানুষকে ভয় দেখাতে

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয়। তার বিপন্নতাকে কাজে লাগাতে হয়। অননুগামিতাকে শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে চিহ্নিত করতে হয়। অনুগামীদের পুরস্কারের লোভ দেখাতে হয়। যশ, অর্থ, রূপ, লাভের আকাঙ্ক্ষা এবং শত্রু বিনাশের শক্তি সঞ্চয়ের সময়ও তখন এসে গেছে। ধর্মের প্রধান প্রয়োগ মানুষের দুর্বলতাগুলোকে কাজে লাগিয়ে আতঙ্কগ্রস্ত এবং লোভী করে তোলা। আত্মোন্নতি এবং আত্মস্বার্থের জন্য উচ্চাকাঙ্ক্ষী করে তোলা। তাই প্রাচীন কূটনীতিবিদ চাণক্য (কৌটিল্য) মহারাজকে উপদেশ দেনঃ 'গণ' গুলোকে দখল করতে গেলে মহারাজ প্রথমে একদল ধর্মপ্রচারক পাঠান। তার অনুগামী হবে লাস্যময়ী সালঙ্কারা নারী।

এই রকম একটা সময় মানেই পৃথিবীর আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থাতে ব্যক্তিগত সম্পত্তির আবির্ভাব। তাই বলা যেতে পারে, ব্যক্তিগত সম্পত্তির যুগে, যখন মানুষের বঞ্চনার ইতিহাস শুরু হয়, তখন থেকেই ধর্মের প্রয়োজন দেখা যায়, দেখা যায় সেগুলোকে মানিয়ে নেবার প্রবণতা এবং সেগুলোর পক্ষে যুক্তি খোঁজা। অন্যদিকে, সামাজিক সংগঠন হিসাবে রাষ্ট্রের আবির্ভাব, যেটাকে সমাজ নিরপেক্ষ হিসাবে হাজির করা হয়। আসলে, রাষ্ট্রের আবির্ভাব এমন একট সময়ের কথা প্রমাণ করে যখন সমাজটা আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব এবং সংঘর্ষে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যাবার দ্বারপ্রান্তে এসে হাজির হয়ে গিয়েছিল। এই সংঘর্ষটা প্রশমিত করার জন্য এমন একটা সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে যেটা সমাজ থেকে উদ্ভূত হলেও সমাজ উর্ধ্ব বলে মনে হয়। তাকে সর্বশক্তিমান হিসাবে হাজির করা হয়। ধর্মের এবং রাষ্ট্রের মাধ্যমে ব্যক্তিগত সম্পত্তির সর্বময় কর্তৃত্বকে স্বীকার করানোর জন্য খোঁজার চেষ্টাতেই ধর্মের উদ্ভব ঘটে। সমাজের প্রচলিত অবস্থার সঠিকতা প্রমাণের জন্য মানুষই ভগবানকে সৃষ্টি করেছে। ভগবান মানুষকে নয়। যার মূল কথা: বিনাশর্তে আত্মসমর্পণ এবং যেমনটি দেখছো চিরকাল এমনটিই ছিল, এবং থাকবে—চিরায়ত, শাশ্বত, ইত্যাদি ধারণা। বদল যা ঘটে সেটা বহিরাবরণের, অন্তর্বস্তুর নয়। ধর্মের অস্তিত্ব নিঃসন্দেহে পিতৃতান্ত্রিকতার সাক্ষ্যবহন করে। সেটা সব ধর্মেই নারী বা স্ত্রীলোক সম্পর্কে অবজ্ঞা এবং ঘৃণা প্রকাশের মধ্যেই দেখা যায়। এই প্রশ্নে, মনুসংহিতা, কোরানের ব্যাখ্যা হুবহু একই রকম। যার মূল কথাঃ স্ত্রীলোক দ্বিতীয় স্তরের মানুষ। রামচন্দ্র অযোধ্যা কাণ্ডে যখন বলেন, "নারী জাতিকে বিশ্বাস করো না। তাদের সামনে কোন কথা বলো না।" তার মধ্যেই 'নারী' সম্পর্কে প্রাচীন ধর্মের মনোভাব প্রকাশ পায়। মনুসংহিতায় ছত্রে ছত্রে বিভিন্ন পর্যায়ে বলা আছে, (দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং অষ্টম অধ্যায় শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত)

(ক) কখনই কোন স্ত্রীলোককে বিশ্বাস করবে না।

(খ) স্ত্রীলোক এবং দাসদের মুক্তি দিবে না, কারণ তারা মুক্তির অযোগ্য।

(গ) কখনই কোন স্ত্রীলোকের সঙ্গে একাকী থাকবে না, সে, তোমার মা, ভগিনী, মেয়ে যেই হোক না কেন।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

(ঘ) তোমার কন্যার সঙ্গে একাকী থেকো না কারণ সে তোমাকে প্রলুব্ধ করতে পারে।
(ঙ) তোমার বোনের সঙ্গেও একাকী থেকো না, সেও প্রলুব্ধ করতে পারে।
(চ) তোমার মায়ের সঙ্গেও একাকী থেকো না সেও প্রলুব্ধ করতে পারে।

মুসলমান ধর্মে তো নারী-কে লোভের উৎস, পাপের আধার বলে চিহ্নিত করাই আছে। খৃষ্টানদের মতেও নারী হচ্ছে মানুষের কাছে অভিশাপ। নরকের দ্বার।

এক কথায়, কী দর্শনগত ব্যাখ্যায়, কী ব্যক্তিগত আচরণের নির্দেশে, একজন গোঁড়া শরিয়তপন্থী এবং গোঁড়া হিন্দুত্ববাদীর কোন ফারাক নেই। শরিয়তপন্থী ওলেমারা কেন বি-জে-পি বা শিবসেনাকে সমর্থন করবে না, আমি তো বুঝতে পারছি না।

মানুষের সমর্থনে দু-চার কথা

তাহলে 'ধর্ম' যা করে থাকে, (ক) 'আত্মবিশ্বাসহীন আতঙ্ক-রোগগ্রস্ত (খ) নারী-বিদ্বেষী (যতই কেন না মেয়েদের সম্বন্ধে দু-চারটে ভালো কথা বলা হোক; যেমন সমগ্র মনুসংহিতায় স্ত্রী লোকদের সম্পর্কে গোটা আষ্টেক লাইনে কিছু ভালো কথা আছে। বাকীটা ঘৃণা, ঘৃণা আর ঘৃণা। মেয়েদের সম্পত্তির অধিকার, কিম্বা মায়ের পায়ের নীচে ছেলের বেহেস্ত বা স্বর্গ এসব বলা হলেও নারী প্রলুব্ধকারী শয়তানের সাগরেদ। তাই তাকে সমাজ এবং লোক চক্ষুর আড়ালে রাখতে হবে—ইত্যাদি নির্দেশ দেওয়া আছে কোরাণে। (মনু এবং মহম্মদ এখানে মিলেমিশে একাকার।) (গ) মানুষকে ভীতু এবং তোষামোদে করে তোলে। (ঘ) শ্রেণীভেদ, অসাম্যকে অনড় অটল ভেবে নিয়ে সেগুলো সহনীয় করে তোলে (ঙ) আত্মসমর্পণের যুক্তি (বৃহৎ শক্তির অন্যায়ের কাছে) সরবরাহ করে। এখন প্রশ্ন হল, এগুলো কেন করতে পারে ধর্ম? একটা কারণ তো আমরা আগেই আলোচনা করেছিঃ প্রকৃতির সঙ্গে নিজের সম্পর্ক এবং প্রাকৃতিক ঘটনাবলীর আত্মসম্পর্কটা বুঝতে বা ব্যাখ্যা করতে না পারার ফলে, 'মন' এবং বস্তুর গতি-প্রকৃতির মধ্যে একটা তৃতীয় শক্তি আরোপ করে সমস্যাগুলোর উদ্দেশ্যমূলক সহজ সমাধানের রাস্তা খোঁজা। এটা গ্রহণীয় করে তোলার জন্য 'ভয়'কে কাজে লাগিয়ে মানুষকে শর্তাধীন করে তোলা। অবশ্যই মৃত্যুভয়টাই ভয়ে-র সেরা।

এই প্রসঙ্গে একটা কথা বার বার মনে রাখতে হবে, পৃথিবীর সমাজ ব্যবস্থাটার সমর্থনে প্রকৃতি থেকে যুক্তি খোঁজা এবং সূত্রবদ্ধ করে মানুষের সামনে হাজির করে তাদের শর্তাধীন করে তোলার পূর্বশর্তটাই হল একদল মানুষের প্রচুর অবকাশ সময় থাকা। সমাজ যতদিন না পর্যন্ত এমন একটা পর্যায়ে উন্নীত হয়, যেখানে সরাসরি উৎপাদন ব্যবস্থা থেকে বিচ্ছিন্ন একদল মানুষ সৃষ্টি হয়, অর্থাৎ বেঁচে থাকার জন্য পরিশ্রম করতে হয় না, ততদিন ধর্মের উদ্ভব সম্ভব নয়। এক কথায়, সমাজ উদ্বৃত্ত উৎপাদন করতে সক্ষম হলেই কেবল ধর্ম বা দর্শনের উদ্ভব সম্ভব।

প্রকৃতির বিবর্তনের ধারাতে অ-জৈব রসায়নগুলোর 'ঐক্য এবং ভাঙন' প্রক্রিয়ার মধ্যেই প্রাণের আবির্ভাব। বিবর্তনের ধারাতে এককোষী প্রাণী থেকে বহুকোষী প্রাণীর

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আবির্ভাব মোটামুটি একটা নিরবিচ্ছিন্ন গতি। প্রাণী দেহ-কাঠামোর মধ্যে পরিমাণগত পরিবর্তনের সময় একটা পর্যায়ে এসে এই রেখ-চিত্রে উল্লম্ফন ঘটে। ধারাবাহিকতায় ছেদ। প্রকৃতিতে ঘটে যায় মহাবিপ্লব—মানুষের আবির্ভাব। মানুষের এই আত্মপ্রকাশে বাহ্যিক শর্ত হিসাবে কাজ করে 'শ্রম'। অন্যান্য প্রাণীদের সঙ্গে অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামে বিশেষ ভঙ্গির শ্রম তাকে দুপায়ে দাঁড়ানো মেরুদন্ডী প্রাণীতে বিকশিত করে তোলে। হাতের মুক্তি ঘটে। হাতের মুক্তির সঙ্গে সঙ্গেই মস্তিষ্কের একটা রূপান্তর ঘটে যায়। পূর্বের ধারাবাহিকতা থেকে এটা সম্পূর্ণ নতুন। যেখানে পূর্বেরগুলো অতল গহ্বরে চাপা পড়ে যায়। অত্যন্ত উত্তেজনা প্রবণ মানুষ নামক এই প্রাণীটার আবির্ভাব একটা প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া..... কোন শক্তিধরের খেয়ালে সৃষ্ট কোন প্রাণী কিংবা কতকগুলো অতিপ্রাকৃতিক জীবের ব্যভিচারের ফসলও নয় মানুষ। এটা একটা 'বিপ্লবাত্মক' প্রক্রিয়া। আদপেই বিবর্তনমূলক নয়। মানুষের বিকাশের ধারাতে দ্বিতীয় বিপ্লব ঘটে যখন, বুড়ো আঙুলের মুক্তি ঘটে, চার আঙুলের বিরুদ্ধে 'বুড়ো' আঙুলের মুক্তি মানুষের কাজের ক্ষমতাকে আরও বাড়িয়ে দেয়। যেগুলো ছিল অনিবার্য সেগুলো তার আয়ত্তের মধ্যে এসে যায়। তাই বলা যেতে পারে মানুষের বিকাশের ইতিহাস হলো অনিবার্যতার রাজত্ব থেকে স্বাধীনতার রাজ্যে প্রবেশের ইতিহাস। মানুষের এই ইতিহাসটা ভুলিয়ে মানুষকে একটা আত্মবিস্মৃত নিয়তি নির্ধারিত 'রাজনৈক' প্রাণী হিসাবে পরিচিত করানোর চেষ্টা চলতে শুরু করে বিকাশের একটা পর্যায়ে এসে।

দেহ থেকে হাতের মুক্তি, হাতের মধ্যে 'বুড়ো' আঙুলের মুক্তি মানুষকে প্রবৃত্তি-সর্বস্ব প্রকৃতি-নির্ভর প্রাণী থেকে সচেতন এবং প্রয়োজনমুখী শ্রমের দিকে ঠেলে দেয়। অর্থাৎ 'প্রবৃত্তি'র ওপরে স্থান পায় 'সচেতনতা', প্রকৃতি-নির্ভরতার (ইকোলজি) ওপরে স্থান পায় অর্থনৈতিক বা উৎপাদন-মুখীন কার্যক্রম (ইকোনমিকস্), প্রকৃতির রাজ্যে এই দুই মহাবিপ্লবের ফলে এই প্রথম প্রকৃতিতে এমন একটা প্রাণীর আবির্ভাব ঘটলো যারা প্রকৃতিকে নিজের প্রয়োজনে ব্যবহার করতে পারে.... উৎপাদনে সক্ষম, প্রকৃতি তাদের মস্তিষ্কে আঘাত করে.... তারা ভাবতে শেখে ভাবনাটাকে বাস্তবে প্রয়োগ করতে চেষ্টা করে....

এহেন একটা প্রাণী আবির্ভাবের মুখেই দেখে সমগ্র প্রকৃতি, পরিবেশ যেন কোমর বেঁধে তার বিরোধিতায় নেমেছে। উত্তাল সমুদ্র, জ্বলন্ত সূর্য..... বিশাল অরণ্য এবং তার হিংস্র পশু সবাই তাকে চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছে.... এগুলোর খামখেয়ালিপনার ব্যাখ্যা পায় না সে। কারণ ব্যাখ্যা খোঁজার মত অবকাশ তার হাতে নেই..... তার ওপর দেখে নিজেদের হঠাৎ মৃত্যু; সংখ্যা হ্রাস পাওয়া..... অস্তিত্ব রক্ষার এই সংকটের মুহূর্তে ধ্বংস হয়ে যাবার ভয়ে যে ভীত হয়ে পড়ে..... 'ভয়' নামক মানসিক অবস্থাটা তার মস্তিষ্কে গেঁথে যায়..... শব্দটার সঙ্গে পরিচিত হবার অনেক অনেক আগেই

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সে 'এই অবস্থাটা'র সঙ্গে পরিচিত হয়ে যায়। পরবর্তীকালেও অন্যান্য সমস্ত প্রবৃত্তি এবং অন্যান্য সমস্ত শর্তহীন পরাবর্তের মতই এটাও মানুষ বয়ে নিয়ে চলেছে বংশ-পরম্পরায়। আদিম মানুষ ধ্বংস হয় না, সেটা চাপা পড়ে থাকে প্রত্যেকটা মানুষের মধ্যেই। যেমন আদিম পৃথিবীর জ্বলন্ত রূপটা ভূস্তরের নানান স্তরের নীচে চাপা আছে। অগ্ন্যুৎপাত পৃথিবীর সেই রূপটা আমাদের মনে করিয়ে দেয়। 'ভয়' সহজাত বা শর্তহীন পরাবর্ত বলেই বলতে হয় 'সাহস' অর্জন করো। মানুষের মধ্যে বস্তুগতভাবেই এটা থাকে বলে ভয়-কে পুঁজি করেই মানুষকে যে কেউ নিজের শর্তাধীন করে তুলতে পারে। এটা অসম্ভব তো নয়... বরং খুবই সম্ভব। তাই প্রতিটি ধর্মই এটাকে পুঁজি করে অগ্রসর হয়েছে....

প্রকৃতির সঙ্গে নিজের সম্পর্কটা কী, এটা বোঝা বা ব্যাখ্যা করার জন্য তার সেই যুগে না ছিল সময়, না ছিল অবকাশ, থাকা সম্ভবও নয়। তাই প্রাকৃতিক ঘটনাবলীগুলোর ওপর নিজের আদলে একটা শক্তির (প্রাণের) আরোপ করে সে সেগুলোর সঙ্গে নিজেদের সম্পর্ক স্থাপন করে ফেলে। এবং সেই মতো বিশ্বাস এবং অনুকরণ করে ফেলে। নিজেদের মধ্যকার বিচিত্র ঘটনাগুলোর ব্যাখ্যা খোঁজে প্রকৃতির মধ্যে। প্রকৃতির ঘটনাগুলোকে খোঁজে নিজেদের মধ্যে। যে অরণ্য তাকে আশ্রয় এবং খাবার জোগাচ্ছে হঠাৎ দাবানলে সেই জঙ্গল তাকে গ্রাস করতে উদ্যত হচ্ছে। যে নদী তাকে তৃষ্ণার জল দেয় সেই নদীর ফুঁসে উঠছে ভাসিয়ে দেবার জন্য, যে সূর্য দিনের আলো দিচ্ছে, সেই সূর্য পুড়াচ্ছে.... এই সব কিছুই তার কাছে প্রকৃতির তিনটে রূপকে তুলে ধরে: স্রষ্টা, প্রতিপালক, সংহারক (সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়)। সে স্রষ্টা প্রকৃতিকে, প্রতিপালক প্রকৃতিকে তুষ্ট করতে চায়, সংহারক প্রকৃতিকে ভয় পায়.., তাকে এড়িয়ে যেতে চায়.. সেগুলি ছিল একেবারেই প্রাকৃতিক ব্যাপার; অতিপ্রাকৃতিক কোন শক্তির অস্তিত্বই তার কাছে ছিল না। অর্থাৎ পুজো করার এবং আত্মসমর্পণ করার মানসিক অবস্থান-টা সেদিনকার সেই আদি অসহায় মানুষের 'সরল-বোঝা' এবং 'সরল' সমাধানের মধ্যেই নিহিত ছিল..... সেগুলোকে খুঁচিয়ে বার করে এনে ধর্ম মানুষকে সেই আদিমতার অবস্থানে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চায়। যে অবস্থানটা মানসিকতার দিক থেকে অর্ধ-পশুস্তর!

'অস্তিত্বের সংকট' মানুষকে ভাবতে শেখায় সংখ্যাবৃদ্ধির কথা, সংখ্যাবৃদ্ধির সমস্যা থেকেই জন্মের 'আকর' অন্য এক ধরণের মানুষের, অর্থাৎ নারীদের গুরুত্ব স্বাভাবিক ভাবেই স্বীকৃত ব্যাপার। অস্তিত্বের পরে সবচেয়ে বড় কথা খাদ্য। বেশি বেশি খাদ্য সংগ্রহের জন্য অনবরত উৎপাদনের (বা খাদ্য সংগ্রহের) উপায় এবং হাতিয়ারগুলোর বিকাশ বা উন্নতি সাধন। তাই বলা যেতে পারে মানুষের সমাজের বৃদ্ধি, বিবর্তন এবং বিকাশের ইতিহাস হল উৎপাদনের উপায় এবং হাতিয়ারগুলোর বিকাশের ইতিহাস.....।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নারী এবং অন্ন

মানুষের মধ্যে একদল, যাঁরা মানুষের জন্ম দিতে সক্ষম, সেই 'মানুষী'-কে শারীরিক কারণেই পরবর্তী প্রজন্মের জন্ম দেবার এবং লালন-পালন করার তাগিদেই একটা সময় কোন একটা আশ্রয়ে আবদ্ধ থাকতে হয়। সেই সময় তার পক্ষে সরাসরি খাদ্য সংগ্রহ কিম্বা শত্রু বিনাশ অভিযানে অংশগ্রহণ সম্ভব হতো না। স্বাভাবিক ভাবেই এই সময় সে থাকার জায়গাটাকে আর-ও নিরাপদ করার দিকে নজর দিতো। এটাই ছিল সমাজে প্রথম 'শ্রম বিভাগ।' প্রাকৃতিক শ্রমবিভাগ। এই সময় সে লক্ষ করলো সংগৃহীত খাদ্য শস্যের যে বীজগুলো তারা ফেলে দিয়েছিল সেগুলো থেকে গাছ হয়েছে। এই ঘটনা মানুষের বিকাশের ইতিহাসকে এক দৈত্যাকার পদক্ষেপে সামনের দিকে ঠেলে দেয়। আবিষ্কার হল ফসল উৎপাদনের কৌশল। বেঁচে যাওয়া কোন গাভী বা ঘোড়ার বাচ্চা হওয়া তাকে পশুপালনের শিক্ষা দেয়। কৃষি এবং পশু পালনের কৌশল আয়ত্ত করে 'নারী' সমাজের মধ্যে নিজের শ্রেষ্ঠত্বটাকে সন্দেহাতীত ভাবে প্রতিষ্ঠা করে।

তারপর ক্রমশ উৎপাদনের উপায় জটিল হয়। সংখ্যাবৃদ্ধি অপেক্ষাকৃত নিশ্চিত খাদ্য সরবরাহের দাবী জানায়। ধাতুর আবিষ্কার উৎপাদনের হাতিয়ারের বিকাশ সাধন করে। কৃষি-কাজটা ক্রমশ পুরুষদের হাতে চলে যায়। উৎপাদনের হাতিয়ার এবং প্রক্রিয়াটার এই হস্তান্তর সামাজিক সংগঠনটাকে জটিল করে তোলে। যুদ্ধবন্দীদের শ্রম 'উদ্বৃত্ত' উৎপাদন করে। সামাজিক সংগঠনেও একটা পরিবর্তন আসে। পরিশ্রমের সঙ্গে বিযুক্ত একদল মানুষের সৃষ্টি হয়। তাদের হাতে আসে প্রচুর অবকাশ। এক কথায় উৎপাদনের হাতিয়ারের ওপর কর্তৃত্বের এই হস্তান্তর ব্যক্তিগত সম্পত্তির ভিত তৈরী করে। সামাজিক শ্রম বিভাগ সেটাকে আরও গভীর করে। একদিন যেটা ছিল সামাজিক দায়িত্ববোধ, সেটা হয়ে পড়ে বাধ্যতামূলক এবং বৈষম্যের পরিচায়ক। এটা এক অবশ্যম্ভাবী দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করে। আগেই বলেছি এই অবস্থাতেই ব্যক্তিগত সম্পত্তির ভিতের ওপরই রাষ্ট্র গড়ে ওঠে। স্বেচ্ছাশ্রমের ওপর ভিত্তি করে মানুষের সামাজিক সংগঠনের জায়গাতে সামাজিক - সংগঠন হিসাবে রাষ্ট্র আসে,—বৈষম্যটাকে গ্রহণযোগ্য করে তোলার উদ্দেশ্যে একটা সংগঠন। আর আসে 'নৈতিক যুক্তি'র হাতিয়ার 'ধর্ম'। মানুষের আদিম অজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে মানুষের বিক্ষোভ প্রশমিত করার অস্ত্র।

ব্যক্তি-সম্পত্তি কিছু মানুষের হাতে যে অখণ্ড অবকাশ এনে দেয় তাতে তারা প্রকৃতির কাজের দিকে মনোনিবেশ করে। ভাবার চেষ্টা করে, সেগুলোর সঙ্গে তার নিজের সম্পর্ক। নিজেদের প্রভুত্বকামী মনোভাব এবং আত্মসমর্পণের আকাঙ্ক্ষার আদলে প্রাকৃতিক ক্রিয়াগুলোকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা চলে। বস্তু জগতের উদ্ভব, বৃদ্ধি, বিকাশ এবং বিনাশ তাকে বিচলিত করে। তার এত 'আরামের জগতে' এত কীর্তি মহিমা, এমন কি সে নিজেই শেষ হয়ে যাবে এটা মেনে নেওয়া তার পক্ষে অসম্ভব।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফলে মৃত্যুর পরেও বেঁচে থাকার বিশ্বাস খুঁজতে থাকে।

এই দুটো অনুসন্ধান বা জিজ্ঞাসা থেকে তিনটে উত্তর খাড়া করে সে: (এক) প্রকৃতির কার্যাবলীর একটা নিয়ন্ত্রণকারী শক্তির অস্তিত্ব কল্পনা করে নেয় (যেমন বাস্তবে ঘটছে সেটা দেখে)। ব্যক্তিগত সম্পত্তির আগে, প্রকৃতিকেই এবং প্রকৃতির বিভিন্ন ঘটনাগুলোকেই ভাবা হতো এই মহাশক্তি, এই প্রথম প্রকৃতির উর্ধ্বে একটা শক্তির কল্পনা মাথায় আসে। এর আগে এই চিন্তাটা সম্ভবও ছিল না কারণ সমাজ-বিকাশও সেই স্তরে ছিল না।

(দুই) "আমি'র 'আমিত্ব'-টা অমর। 'মন' (মাইন্ড) এবং বাস্তবতার (ম্যাটার) সম্পর্কটার মধ্যে একটা তৃতীয় শক্তি আত্মাকে বসাতে পারলে খুব সহজে অনেক কিছু বোঝা যায়। 'আমার' এই দেহটাই কেবল ধ্বংস হয়। 'আমি' বেঁচে থাকি 'আত্মা'র মধ্যে। তাকে .....এই চিন্তা সান্ত্বনা দেয়, মৃত্যুকে গ্রহণীয় করে তুলতে সাহায্য করে। সেটা নিয়ন্ত্রণ করে সেই অতি প্রাকৃত মহাশক্তি। আত্মার ধারণা থেকেই আসে 'পুনর্জন্ম', যেটা নির্ভর করে এই জগতের কর্মফলের উপর। অর্থাৎ এই জন্মে দুর্দশা সহ্য করেও বিদ্রোহজাত পাপগুলো না করলে অননুগামী না হলে পরের জন্মে ভাল হবে। মরণোত্তর দুনিয়াই সৃষ্টি করে পুনর্জন্ম না মানলেও আত্মাগুলো সেই দুনিয়ায় সুখে থাকবে এই জীবনবোধ।

(তিন) সম্পত্তির উত্তরাধিকার চিন্তা। আমার মৃত্যুর পর যেমন 'আমিত্ব'-টা বেঁচে থাকে, আমার সম্পত্তি এবং কর্তৃত্ব বেঁচে থাকে আমার বীজ বা রক্তের মধ্যে। রক্তের সংস্কার জন্ম লাভ করে। উত্তরাধিকারের মধ্যে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার চিন্তা থেকেই আসে সন্তান-সন্ততির মধ্যে 'আমার বীজ'।

এতদিন পরবর্তী প্রজন্ম রক্ষা করাটা ছিল সামাজিক প্রয়োজন, এখন সেটা হয়ে গেল ব্যক্তিগত। 'বংশরক্ষা' হটিয়ে দিলো 'প্রজাতি' সংরক্ষণের চিন্তাকে।

আমার 'বংশ' বা 'বীজ' এই চিন্তার সঙ্গে সঙ্গেই আসে, 'বীজ' ধারণ যে করছে তার ওপর অধিকার। 'নারী'-দের ওপর অধিকার। 'জমির ওপর অধিকারবোধ', নারীর ওপর অধিকারে রূপান্তরিত হয়। প্রকৃতপক্ষে নারীদের লাঞ্ছনার বৃত্তটা সম্পূর্ণ হয়।

এতদিন মানুষের যে অংশটা একচেটিয়া কর্তৃত্ব করে এসেছে তারা এই লাঞ্ছনা বিনা প্রতিবাদে মেনে নেয় নি। কেউ কেউ মনে করেন, বিবাহিত নারীর সিঁদুর, নোওয়া (লোহা), আংটি, 'মঙ্গলসূত্র' সেই বিদ্রোহী মানুষ (নারী) দের 'রক্তাক্ত' এবং 'বন্দীত্ব' স্বীকার করে নিতে বাধ্য হওয়ার স্মারক। 'পুরুষ-কর্তৃত্বে'র অর্থাৎ ব্যক্তিগত সম্পত্তির দর্শন, ধর্ম, 'নারী-বিদ্বেষ' এবং 'নারীদের প্রতি ঘৃণা' জাগাবার জন্য তার যাবতীয় যুক্তি নিয়ে হাজির হয়। 'নারী'দের অধীনস্থ করার যুক্তি সরবরাহ করে। (পরবর্তীকালে সাম্রাজ্যবাদীরা কোন দেশকে বা জাতিকে অধীনস্থ করতে গেলে যে সমস্ত যুক্তি ব্যবহার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করেছে) নারীদের 'লোভী', 'পাপী', মানুষের দুর্দশার কারণ পর্যন্ত অন্য এক ধরণের মানুষ ইত্যাদি বিশেষণে ভূষিত করে মনু থেকে মহম্মদ ব্যক্তিগত সম্পত্তির বংশানুক্রমিক ভোগদখলকেই সুনিশ্চিত করতে চেয়েছেন।

'কুকুরটাকে পাগল বলে প্রচার করো, তারপর খতম করো'—এটাই হলো ধর্মের নীতি। পরবর্তীকালে বিভিন্ন 'ধর্ম' পরস্পরের মধ্যে আধিপত্যের লড়াইয়েও এই একই নীতি অনুসরণ করে চলেছে। ইসলাম ধর্মের বিরুদ্ধে হিন্দুদের প্রচার, ইহুদীদের সম্পর্কে খৃষ্ট ধর্ম এবং ইসলামের প্রচার, হিন্দুর বিরুদ্ধে খৃষ্ট এবং ইসলাম ধর্মের প্রচার লক্ষ্য করলেই এটা বোঝা যাবে। চোরেদের বখরাতে গণ্ডগোল হলে যেমন তাদের খেউড় থেকে চোর চেনা যায়, বিভিন্ন ধর্মের ধর্মীয় নেতাদের এই খেউড় আসলে ধর্মের স্বরূপটাই প্রকাশ করছে।

'নারী'-দেরও সেই রকম কুৎসিতভাবে চিহ্নিত করে, 'কোতল' বা 'দাস' বানানোর নৈতিক যুক্তি হচ্ছে ধর্ম। তাই ব্যক্তিগত সম্পত্তির চিন্তার বিরোধিতা না করে নারী-মুক্তির কথা বলার অর্থ, 'বন্ধনটার শেকল'টাকে আড়াল করা বদমায়েসি। প্রকৃত নারীমুক্তি ঘটতে পারে কেবলমাত্র তখনই যখন উৎপাদন ব্যবস্থার ওপর তাদের কর্তৃত্বটা আবার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা যাবে। সেদিনই মনুষ্যসমাজ প্রকৃত সভ্যতার দিকে এগিয়ে যাবে। এটা সামাজিক বিপ্লবের কাজ। পুরুষদের বিশেষ অংশ যারা উৎপাদন করেন অথচ নিজের পরিশ্রমের ফসল থেকে বিচ্ছিন্ন, তারা এবং নারীরা একই দুর্ভাগ্যের অংশীদার। তাদের শত্রুও একই। ব্যক্তি-সম্পত্তি এবং পরশ্রমজীবী সম্প্রদায়।

AMARBOI.COM

রাষ্ট্র এবং ধর্ম

তা'হলে দেখা যাচ্ছে, ব্যক্তিগত সম্পত্তির ভিতের ওপর গড়ে ওঠা ইমারতটার দু'টো প্রকোষ্ঠ — ধর্ম এবং রাষ্ট্র। যাদের মূল উদ্দেশ্য হল সংঘর্ষ প্রশমিত এবং অবদমিত করা, সমাজকে আত্মকলহে ধ্বংস হয়ে যাবার হাত থেকে রক্ষা করা, ঐক্যবদ্ধ রাখা। যাতে যেমনটি আছে তেমনটিই থাকে। 'ধ্বংস' মানে ভিতটার ধ্বংস।

কিন্তু 'রাষ্ট্র'-টা হচ্ছে একেবারে পার্থিব ব্যাপার। সমাজ-বিকাশের প্রতিটি স্তরের সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত। আগেই বলেছি, কোন সমাজকে টিকে থাকতে হলে, অনবরত উৎপাদনের হাতিয়ারগুলোর উন্নতি সাধন করে যেতেই হবে। এই 'উন্নতি সাধন' প্রক্রিয়াটা সম্পত্তিবানদের মধ্যে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের জন্ম দেয়। তখন বিকশিত হাতিয়ারের মালিকদের সঙ্গে, প্রচলিত ব্যবস্থার মালিকদের সংঘর্ষ দেখা যায়। 'ধর্ম', যার মূল কথা 'আত্মসমর্পণ' এবং 'শাশ্বত'-এর ধারণা, প্রচলিত ব্যবস্থার মালিকরা তখন সেটাকে ব্যবহার করার চেষ্টা করে। নিজেদের সামাজিক কর্তৃত্ব বজায় রাখার জন্য 'রাষ্ট্র'কেও তারা নিজেদের মধ্যকার এই বিকশিত সম্প্রদায়টার বিরুদ্ধে ব্যবহার করার চেষ্টা করে।

নতুন এই সম্প্রদায়টা, যারা নতুন জ্ঞান-বিজ্ঞানের দ্বারা বলীয়ান, তারা দেখে বিকাশের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পথে পার্থিব অন্তরায় হিসাবে দেখা যাচ্ছে প্রচলিত সামাজিক কর্তৃত্ব। রাষ্ট্রের মাধ্যমেই সে এমন একটা অবরোধ সৃষ্টি করছে যাতে নতুন হাতিয়ারে সমৃদ্ধ উৎপাদন ব্যবস্থাটা আত্মপ্রকাশ করতে পারছে না। এ-যেন মাতৃগর্ভে বেড়ে ওঠা শিশুটা পৃথিবীর আলো দেখতে চাইছে, ভূমিষ্ঠ হতে চাইছে, অথচ তাকে জোর করে আটকে রাখা হচ্ছে। যন্ত্রণায় বিকৃত মাতৃদেহ। সমগ্র সমাজ একটা চরম সংকটে দুমড়ে মুচড়ে যাচ্ছে। সুতরাং রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের সম্ভাবনা তৈরি হয়। নয়া-সম্প্রদায়টা নতুন হাতিয়ারে সজ্জিত হয়ে এই বিদ্রোহের স্বপক্ষে যুক্তি খোঁজে। তাদের অর্জিত জ্ঞান বিজ্ঞানের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে 'সব কিছু পুরানোর সংস্কার' দাবী করে। দাবী ওঠে প্রচলিত রাষ্ট্রের নৈতিক শক্তির উৎস যে 'ধর্ম' সেটাকেও সংস্কার করতে হবে। তাদের মধ্যকার একটা শাখা, নতুন এই শক্তির নৈতিক সমর্থনে আসরে নামে। কিন্তু প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থাটাকে ভাঙা বা দখল করাটা তো তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। সঙ্গে চাই ব্যাপক মানুষকে। তাই 'বঞ্চিত মানুষ'দের কিছু দাবীও এই সব সংস্কারকদের দাবীতে স্থান পায়। ধর্মের আসল উৎসস্থানে বা মূল জায়গাতে আঘাত না করে অক্সিজেনের অভাবে খাবি খাওয়া ধর্মটাকে অক্সিজেন এবং রক্ত দেবার জন্য একটু ফুটো করে দেবার চেষ্টা হয়। সম্পত্তিবানদেরই একটা অংশকে সামাজিক কর্তৃত্বের জায়গাতে বসাবার জন্য নতুন ধর্ম দিয়ে মানুষকে শর্তাধীন করে তোলার নামই ধর্ম-আন্দোলন। বিভিন্ন ধর্মপুস্তকের নির্দেশে যে মাঝে মাঝে হঠাৎ হঠাৎ একটা একটা ভালো কাজ দেখা যায়, তার কারণ এটাই অর্থাৎ জনগণ যখন ধর্মের অনুশাসন এবং ধর্মগুলোকেই বাস্তব অভিজ্ঞতা দিয়ে চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছে, তখন এই সংযোজনগুলো ধর্মে স্থান পেয়েছে।

সুতরাং ধর্মের প্রগতিশীলতা, বা ধর্মীয় নেতাদের জনগণের দাবীকে সামনে আনার সংগ্রামটা আসলে ধর্মকে বাঁচিয়ে রেখে, সম্পত্তিবানদেরই একটা অংশকে সামাজিক কর্তৃত্বে প্রতিষ্ঠা করার সংগ্রাম। অবশ্যই এই সংগ্রামে তাদের প্রাতিষ্ঠানিক সমস্ত সংগঠনের (রাষ্ট্র সহ) হাতে অশেষ লাঞ্ছনা সহ্য করতে হয়েছে। কিন্তু যখনই তারা সামাজিক কর্তৃত্বটা দখল করে ফেলে তখনই দেখা গেছে, তারা নিজেরাই প্রতিষ্ঠান পূজোতে মেতে ওঠে। নিজেরা চরম প্রাতিষ্ঠানিক হয়ে পড়ে। বঞ্চিত মানুষের আঘাতে তারা নিজেরাই আবার শামুকের মত শক্ত খোলের (ধর্ম) মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করে।

ক্ষমতায় আসার জন্য যে-মানুষকে তারা পূর্বমতের ('মানুষ ক্ল্যাসিক', অর্থাৎ চিরায়ত পূর্ব - নির্ধারিত এক চরিত্রের) বিরোধিতা করে রোমান্টিক (অর্থাৎ অনুভূতি এবং কল্পনা-প্রবণ, পাল্টে দেবার এবং পাল্টে নেবার অধিকারী) বলে আবিষ্কার করেছিল, ক্ষমতায় এসেই তারা তাদের শিল্প-সাহিত্য-দর্শন এবং নতুন ধর্মমত দিয়ে বোঝাতে চেষ্টা করে,—মানুষ নিয়তি নির্ধারিত, প্রবৃত্তি-সর্বস্ব একটা জীব। "টিয়াকে যতই কৃষ্ণ-কৃষ্ণ শেখাও, বেড়াল তাড়া করলে তার গলা থেকে ট্যাঁ, ট্যাঁ শব্দই বেরুবে'—বিবেকানন্দ-গুরু রামকৃষ্ণ ঠাকুরের মানুষ সম্পর্কে এটাই ছিল ধারণা।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ত্রি-স্তর মস্তিষ্কের আবিষ্কার (ঈদ, ইগো, সুপার ইগো), 'বাস্তবতাবাদ', 'যুক্তিবাদ' প্রভৃতি দর্শন দিয়ে মানুষকে এক অসহায় প্রাণী হিসাবে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা চলে। ফরমাল লজিকের জায়গাটা নিয়ে নেয় 'দর্শন শাস্ত্র।'

নিজেদের অবস্থাটাকে সুদৃঢ় করার জন্য, এই সম্প্রদায়কে উৎপাদন পদ্ধতিটাকে উন্নত থেকে উন্নততর করে তুলতে হয়। সামাজিক শ্রম বিভাগকে দৃঢ়তার সঙ্গে কার্যকরী করতে হয়। শ্রমের বিশেষ বিশেষ বিভাগকে যুক্তিসিদ্ধ করানোর জন্য শিল্প-সাহিত্য-দর্শন এবং ধর্ম এগিয়ে আসে। মানুষের আদিম সরলতা এবং অজ্ঞানতাগুলোকে কাজে লাগিয়ে তাকে শর্তাধীন করে তোলে, যাতে তারা বুঝতে পারে তাদের দুর্দশাগ্রস্ত বর্তমানটা চিরকাল ছিল, আছে এবং থাকবে।

তাদের বুঝতে দেওয়া হয় না, সমাজে একটা সময় ছিল, যখন ধর্ম, পেশা, রাষ্ট্র, কিছুই ছিল না। প্রত্যেকটা মানুষই স্বেচ্ছায় শ্রম করতো। প্রত্যেকটা মানুষই ছিল স্বাধীন। সমাজ থেকে আসা কোন শক্তির চাপে তার অস্তিত্ব ধ্বংস, বিপন্ন হবার আশংকা ছিল না। সমাজের বাইরের শক্তিকে মোকাবিলা করার ক্ষেত্রে তারা ছিল ঐক্যবদ্ধ সমাজ। সে পরিশ্রম করতো সমাজের জন্য, সমষ্টির জন্য। ব্যক্তির জন্য নয়। ব্যক্তি ছিল সমষ্টির ন্যূনতম একক মাত্র অর্থাৎ ব্যক্তিগুলোর যোগফল সমষ্টি নয়, সমষ্টির একক ব্যক্তি। সমষ্টির জন্য খাটলে সেই খাটনি তার নিজের জন্যই হবে। তাই 'শ্রম' করাটা ছিল সম্মানের। 'শ্রম' তাই ছিল 'জীবনের' গ্যারান্টি। সমাজের মাধ্যমে নিজের শ্রমের ফসলের মালিক ছিল সে নিজেই। সুতরাং এই রকম একটা অবস্থান থেকে এই মানুষকে যখন অন্যের জন্য 'শ্রম' করতে হয়, তার 'শ্রমের ফসল' থেকে তাকে বঞ্চিত করতে হয়, সেই মানুষকে তো দেখাতে হবে ব্যক্তিগুলো মিলেই সমষ্টি। 'বেশি করে শ্রম করো তাহ'লে তোমার উন্নতি হবে আর তোমার উন্নতি মানেই সমাজের উন্নতি।' শুরু হয় আত্মোন্নতির জন্য পরস্পরের সঙ্গে প্রতিযোগিতা। শ্রমের ফসল থেকে বিচ্ছিন্ন এই মানুষ একটা অন্বয় খোঁজে। 'ধর্ম' এসে হাজির হয়।

যাই হোক না কেন, বাস্তবে কিন্তু একটা ঘটনা ঘটে যায়। শ্রম বিভাগের ফলে, উৎপাদনের চরিত্রটাই পাল্টে যায়। সেটা হয়ে যায় সামাজিকীকরণ। উৎপাদনের চরিত্রের এই সামাজিকীকরণ উৎপাদনকে অর্গলমুক্ত করে দেবার সম্ভাবনা নিয়ে হাজির হয়। মালিকানাটা সমাজের কর্তারা ব্যক্তিগতই রাখতে চায়। ফলে উৎপাদন সম্পর্কে (প্রক্রিয়া এবং ভোগ) একটা সংকট সৃষ্টি হয়। এই সংকট মুক্তির জন্য রাজনৈতিক ক্ষমতাকে ব্যবহার করতে হয়। রাষ্ট্র তার সমস্ত সংগঠন নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে। রাষ্ট্রের সর্বময় কর্তৃত্বটাকে হাজির করা হয়। শুরু হয় রাষ্ট্র-পূজো। অর্থাৎ অন্যভাবে বললে বলতে হবে রাষ্ট্রের সর্বময় কর্তৃত্ব (ওলিগার্কি)কে স্বীকার করিয়ে নেবার জন্যই একটা ঈশ্বরের সৃষ্টি। এক কথায় সমাজ এখন এমন একটা স্তরে পৌঁছে গিয়েছিল, ভগবান না

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থাকলেও একটা ভগবান সৃষ্টি করতেই হতো।

পৃথিবীতে ভগবানের এই আবির্ভাবটা কিন্তু খুব একটা শান্তিপূর্ণ উপায়ে হয়নি। সামাজিক সংগঠনে সামাজিক কর্তৃত্বের স্থানে ব্যক্তি বা গোষ্ঠী কর্তৃত্ব, উৎপাদনের মালিকানাকে ব্যক্তিগত করে তোলা, এগুলোকে মানুষ সহজে মেনে নেয়নি। সুতরাং এগুলোর নৈতিক সাফাই 'ধর্ম'কেও তারা মেনে নেয়নি। ধর্ম-পুস্তকগুলোতে অভিশাপে ভস্ম হয়ে যাওয়া (মানে পুড়িয়ে দেওয়া), জিব খসে পড়া (মানে জিব কেটে নেওয়া) থেকে উৎখাত করার যে বর্ণনা পাওয়া যায়, সেগুলোর প্রত্যেকটারই শিকার হয়েছিলেন সে যুগের বিদ্রোহীরা। এই সমস্ত খুন, জখম, উৎখাত, উচ্ছেদকে ভগবানের অভিশাপ কিম্বা খোদার 'লানৎ' বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। সুতরাং সামাজিক সাম্য, ন্যায়-এর ধ্বংসের ওপরই ধর্মের জন্ম। 'অন্যায়' এবং 'অসাম্যে'র ভিতের ওপরই ধর্ম এসেছে। কোন ধর্মই শান্তির দূত নয়।

তাহলে দেখা যাচ্ছে ব্যক্তিগত সম্পত্তির আবির্ভাব তার নৈতিক সাফাই হিসাবে জন্ম দেয় ধর্মের। আর তার পার্থিব সংগঠন 'রাষ্ট্র'। সবগুলোই পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থার পরিচায়ক। পিতৃতান্ত্রিক সমাজের রাজনৈতিক ফর্মের উচ্চতম স্তর 'ফ্যাসিবাদ।' ফ্যাসিবাদ-এর উৎস-সন্ধানে যেতে গেলে তার নৈতিক যুক্তিগুলোকে খুঁজতে হবে। তাই ফ্যাসিবাদ তার প্রতিষ্ঠার জন্য ধর্মকেই ব্যবহার করে। বরং বলা যায় ধর্মের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি পার্থিব জগতে ফ্যাসিবাদ।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ফ্যাসিবাদের উৎস সন্ধানে—হিন্দু ধর্মে

ফ্যাসিবাদ (নাৎসিবাদ সহ) কথাটা বিংশ শতাব্দীর। এই শতাব্দীর বিশের দশকে ইতালি যখন জাতীয়তাবাদী এবং সমাজতন্ত্রীদের অপদার্থতা, দুর্নীতি আর বেইমানির ফলে ধ্বংসের মুখে, একটা চরম নৈরাজ্য এবং হতাশা সমগ্র ইতালিকে গ্রাস করেছে, সেই সময় এই মতবাদের জন্ম। একদা সমাজতন্ত্রী মুসোলিনি এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। একই মতবাদের ভিত্তিতে জার্মানিতেও একটা অনুরূপ মতবাদ জন্মলাভ করে এক আমেরিকান মহিলার পৃষ্ঠপোষকতায়। একই সালে ইতালি-তে এই মতবাদের লোকগুলো ক্ষমতায় আসে। জার্মানিতেও তাদের কাউন্টার পার্ট প্রায় একই সময়ে ক্ষমতাতে আসে। অথচ এই ক্ষমতাতে আসার কিছুদিন পূর্বে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে, ইতালির ফ্যাসিস্ত পার্টি মাত্র শতকরা তের (১৩%) এবং জার্মানির জাতীয় সমাজতন্ত্রীরা শতকরা মাত্র চোদ্দ (১৪%) ভাগ ভোট পায়। তার অল্প কিছুদিন পরে তারা দেশের ক্ষমতাতে এসে যায়।

ইতালির ক্ষেত্রে মুসোলিনির বক্তব্য অনুযায়ী, 'লোকে আমাকে জিজ্ঞাসা করছে, ইতালির ভবিষ্যৎ কী? আমি বলি আমরা ক্ষমতায় আসবো। আপনারা অবাক হচ্ছেন কী করে সেটা সম্ভব? আমরা তো মোটে শতকরা তের ভাগ ভোট পেয়েছি। আমি আপনাদের আশ্বস্ত করছি তার কারণ (১) সমাজতন্ত্রী এবং জাতীয়তাবাদীরা (এর আগে এদের ঐক্যবদ্ধ জোট ক্ষমতায় ছিলেন—লেখক) দুর্নীতিগ্রস্ত এবং অয়েসী হয়ে গেছে। জনগণের প্রত্যাশা পূরণে তারা ব্যর্থ। আমরা তাদের আরও দুর্নীতিগ্রস্ত করে তুলবো, (২) আমার সঙ্গে কথা হয়েছে সমগ্র ইতালি জুড়ে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সৃষ্টি করতে হবে আমাদের—জনগণের মধ্যে যাতে আতঙ্ক এবং নিরাপত্তাহীনতা বোধ গেড়ে বসে। (৩) এই সময়ে সমগ্র ইতালি জুড়ে আমাদের মহান প্রাচীন গৌরব পুনরুদ্ধারের জন্য অভিযান চালাতে হবে। (৪) আন্তর্জাতিকভাবে আমরা আমাদের সমর্থনে বিভিন্ন দেশ থেকে লোক পাবো (তুচ্ছির শান্তিনিকেতনে এসে মিথ্যাচার এবং আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়ের টোপ দেখিয়ে রবীন্দ্রনাথকে দলে ভেড়াবার চেষ্টা এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। রঁলাকে ধন্যবাদ। তিনি কবি-কে এবং তাঁর সঙ্গে সমগ্র বাঙালি জাতিকে এক মহাবিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা করেন। এবং শেষ পর্যন্ত কবি-কে তুচ্ছির ষড়যন্ত্রটা বোঝাতে সক্ষম হন)। (মিনিটস অব ফ্যাসিস্ট পার্টি থেকে)।

খুবই মজার ব্যাপার, তাই না। আতঙ্ক সৃষ্টি এবং অতীত ঐতিহ্যে (মহান রোম সাম্রাজ্যের বীর গাথা) ফিরে চলো স্লোগানের সমন্বয় সাধন! আতঙ্ক সৃষ্টির জন্য কাকে ব্যবহার করা হচ্ছে? ধর্ম এবং ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতা।

এবার দেখা যাক, হিটলারের সাংগঠনিক নীতির বিষয়টা সম্পর্কে সে নিজে কি

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বলে: আমি দেখেছি আতঙ্ক এবং খুনের একটা প্রভাব মানুষের মধ্যে আছে। আমি এটাও লক্ষ্য করলাম শারীরিক ভীতিপ্রদর্শন (ইনটিমিডেশন), ভীতি- প্রদানকারী এবং ভীত, দুজনের ওপরই কার্যকর ভূমিকা পালন করে থাকে। এটা যেমন ব্যক্তির ক্ষেত্রেও খাটে সমষ্টির ক্ষেত্রেও খাটে।

কারখানায় শিল্প-প্রতিষ্ঠানে এবং আইনসভাতে ভীতি প্রদর্শন খুব ভালো ফল দেয়, যতদিন পর্যন্ত একটা পাল্টা সন্ত্রাস তার মুখোমুখি না হয়, ততদিন এটা খুবই কার্যকরী সুতরাং ফিজিকাল অ্যাণ্ড মেন্টাল টেরর ইজ দ্য কি টু বিল্ড অ্যান অরগানাইজেশন—শারীরিক এবং মানসিক সন্ত্রাস সৃষ্টিই একটা সংগঠন গড়ে তোলার চাবি কাঠি—(হিটলারের আত্মজীবনী)। তার পার্টি, জাতীয় সমাজতন্ত্রী দলের সাংগঠনিক ভীতির ভিত্তি কী হবে সেই প্রসঙ্গে হিটলারের বক্তব্য: জাতি (রেস) এবং রক্ত। ইহুদীগুলো সব মার্ক্সিস্ট! মার্ক্সিস্টরা দুনিয়ার মুক্তি চায় কিন্তু ইহুদিদের মুক্তি দিতে পারে এমন কোন শক্তিই নেই এই পৃথিবীতে। (ওদের মুক্তি একমাত্র নিধনে) আমি পৃথিবীকে ইহুদী-মুক্ত করার জন্য সেই সর্বশক্তিমান দ্বারা আদিষ্ট ব্যক্তি।

হিটলারের জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের কর্মসূচীর শিক্ষানীতিতে পরিষ্কারভাবে শিশু বয়স থেকেই রক্ত এবং জাতি সম্বন্ধে সচেতন, দৃঢ় নাগরিক তৈরির পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে ফ্যাসিবাদ বা নাৎসিবাদ একটা বিশেষ ঐতিহাসিক মুহূর্তের ফসল। কিন্তু কোন বিশেষ, নির্দিষ্ট আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার ফসল এটা মোটেই নয়। ফ্যাসিবাদের জন্য কোন দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাটা 'অমনটি হতেই হবে, না হলে হবে না, ওটা জন্মাতে পারে না' ইত্যাদি কথা পণ্ডিতদের গো-মূর্খামি। যে কোন আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থাতেই, সংকটটা যদি এমন একটা পর্যায়ে এসে যায় যে শাসক শ্রেণী, ভেতর এবং বাইরে থেকে আক্রমণের কিনারে এসে গেছে অথচ জনগণ (বিক্ষুব্ধ কিন্তু হতাশ) সংগঠিত নন, তাদের সামনে কোন আলোর রেখা নেই, অদ্ভুত এক নিরাপত্তাহীনতা তাদের চলচ্ছক্তি-রহিত করে দিয়েছে, তারা আত্মবিশ্বাসহীন, বিশ্বাসঘাতকতার বলি-এই জনগণ খুব স্বাভাবিকভাবেই এক সর্বশক্তিমানের আগমনের অপেক্ষায় থাকে। মানসিক জগতে সেই শক্তির একটা মূর্তি তো তার কল্পনাতেই আছে। এখন তাঁদের প্রত্যাশা 'শুধু তিনি তাঁদের দেশে নরদেহে আবির্ভূত হোন'। কৃষ্ণ অথবা হিটলার, মহম্মদ অথবা মুসোলিনি যে আকারেই তিনি আসবেন মানুষ তাঁকে নেবে।

তাঁরা আসেন। আসেন আতঙ্ক-কে পুঁজি করে। এই আতঙ্ক-সৃষ্টিটা তাঁরা যেমন শারীরিক ভীতিপ্রদর্শন দিয়ে করেন তেমনই মানসিক জগতে হামলা চালিয়েও করেন। তাই এটাকে বলা যেতে পারে 'কালচারাল অ্যাগ্রেসন' বা সংস্কৃতির জগতে হামলা। এটা একটা সংস্কৃতি। সুতরাং এর সব চেয়ে ভালো মাধ্যম ধর্ম। কিছু ভালো ভালো স্লোগান, রক্তের বিশুদ্ধতা, জাতি এবং প্রাচীন গৌরব-গাথা যা দিয়ে মানুষকে উত্তেজিত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করে শর্তাধীন করা যায়। বর্তমানটাকে অক্ষত রেখেই মানুষ মেতে ওঠে এক ধ্বংসের খেলায়। ফলে ঘটে যায় দৈত্যাকার পদক্ষেপে পশ্চাদগমন। তাই তাদের স্লোগান, 'দাদা, পেছনের দিকে এগিয়ে যান তো!'

ফ্যাসিবাদ এবং নাৎসিবাদের এই ভিতটা তাহলে স্পষ্টতই তৈরি হয়েছিল ধর্ম এবং ধর্মীয় দর্শনের মধ্যে। যার মূল কথা, একটা শক্তির কাছে আত্মসমর্পণ করো, না হলে ধ্বংস হও! জাহান্নামে যাও! হিন্দু-মুসলমান সব ধর্মীয় নেতাদের হিটলার বা মুসোলিনিকে প্রশংসার কারণ এটাই।

১৯৭১ সালে লেওন মোলিয়াকভ ফরাসি ভাষায় 'এরিয়ান মিথ' বলে একটা পুস্তক লেখেন। সেটা অনুবাদ করেন এডমণ্ড হাওয়ার্ড। সেখানে তিনি দেখিয়েছেন: প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে অত্যাচারীরা যে জুলুম এবং অত্যাচার করেছে, সে-সবগুলোর পেছনে তারা যুক্তি খুঁজে পেয়েছে আর্য ভাবাদর্শ এবং জীবনদর্শন থেকে। তাঁর মতে এই আর্য জীবনদর্শনই জার্মান নাৎসিবাদের উৎস এবং পৃথিবীতে অন্তত পক্ষে দুটো মহাযুদ্ধের দর্শন (ফিলজফি)।

জাপানি অ্যাকেডেমিসিয়ান মিসেস ইয়ুমিৎস্বজি মনে করেন, 'জাপানে যে বর্ণবাদ চালু হয়েছে তার যুক্তির সরবরাহ করছে আর্য মানসিকতা ....।'

এত কথা না বলেও আধুনিক ফ্যাসিবাদ (এবং নাৎসিবাদ)-এর জনক হিটলার তাঁর কাজের দর্শন খুঁজেছেন নীৎসের মধ্যে। নীৎসে তাঁর পর্যবেক্ষণ, অনুশীলন, মতাদর্শ প্রতিষ্ঠা করেছেন শোপেনহাওয়ারের মতো, যেটা আবার ভারতীয় রহস্যবাদ বা মিষ্টিসিজমের ওপর প্রতিষ্ঠিত। তাই একদা সাম্যবাদী এম. এন. রায় যখন মার্ক্সবাদী ছিলেন, তাঁর 'দি ফিলজফি অব ফ্যাসিজম' প্রবন্ধে বলেছিলেন, "ফ্যাসিবাদ হচ্ছে হেগেলীয় দ্বন্দ্বতত্ত্বের ব্যঙ্গচিত্র। এই নতুন বুদ্ধিবাদ উল্লেখযোগ্য ভাবে হিন্দু রহস্যবাদের সঙ্গে এক" (A caricature of Hegelian dialectics, this neo-Scholasticism is remarkably similar to Hindu Mysticism)

এই 'রহস্যবাদ' বস্তুটি কি? তা হ'ল এমন একটা মানসিক-বিশৃঙ্খলার অবস্থা যখন একজন পরীক্ষালব্ধ বৈজ্ঞানিক সত্য ও যুক্তিসিদ্ধ সিদ্ধান্তকে প্রত্যাখ্যান করে কুসংস্কারের মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করে থাকে। পরীক্ষিত যুক্তির জায়গা নেয় বিশ্বাস। যার বহিঃপ্রকাশ দেখতে পাই 'বিশ্বাসে মিলায় বস্তু তর্কে বহুদূর' এই ধর্মীয় অনুশাসনমূলক প্রবাদে। ভারতীয় হিন্দুত্ববাদী রাজনৈতিক দলের নেতা কল্যাণ সিং কিম্বা আদবানিকে যুক্তি প্রমাণ দিয়ে যখন দেখিয়ে দেওয়া হয়, 'শ্রী রামচন্দ্র নামক কোন প্রাণীর অস্তিত্ব বাস্তবে ছিল না, এটা কবির মস্তিষ্কে বাস্তবের বর্ধিত এবং উল্টো প্রতিফলন মাত্র, কারণ রামায়ণে বর্ণিত অযোধ্যার বর্ণনার সঙ্গে বাস্তবে অযোধ্যা বলে কথিত অঞ্চলটার ভৌগোলিক অবস্থানের কোন সাদৃশ্য নেই।' 'চোখের ওপর মেলে ধরা প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলোকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অস্বীকার করে তাদের উত্তর 'এ বিশ্বাস কী সওয়াল! সায়েন্স কী নেহি!' এটা বিশ্বাসের প্রশ্ন, বিজ্ঞানের বিষয় নয়। বস্তুহীন, যুক্তিহীন বিশ্বাস থেকেই জন্ম এ 'দুনিয়া মায়া' মাত্র। একটা ভ্রম। সুতরাং ভাষাহীন চিন্তাই চিন্তার প্রকৃষ্ট এবং সর্বোৎকৃষ্ট রূপ। (অর্থাৎ তোমার ওপর নামিয়ে আনা অত্যাচার, শোষণ, এগুলো সবই ভ্রম। আসলে এগুলোর কোন অস্তিত্বই নেই। তুমি পরম শক্তির কাছে আত্মসমর্পণ করো, তাহলেই হবে!) কিন্তু বাস্তবে তো সেটা চলতে পারে না। তাই অচিরেই তার সামাজিক উপযোগিতা ফুরিয়ে যায়। রায়ের ভাষায় 'অবশেষে যুগোত্তীর্ণ মায়াকে বাতিল করা হয় বিপ্লবীর সাহস নিয়ে নয়, বরং কপটতাপূর্ণ অনুমোদন নিয়ে, যার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি ঈশ্বরের আশীর্বাদধন্য নগ্ন ভোগবাদ। যেটা বিবেকানন্দের "ভালো মন্দের ঊর্ধ্বে" উত্তরিত হবার তত্ত্বে দেখতে পাওয়া যায়।' তাঁর মতে, 'মানসিক অবস্থানকে এমন একটা পর্যায়ে উন্নত করতে হবে যেখানে, ভালো-মন্দ বোধই বিলুপ্ত হয়ে যায়।' রবীন্দ্রনাথ সেই চিন্তার বিরোধিতা কবে প্রশ্ন তুলেছেন, 'আলো কি অন্ধকারের সঙ্গে একই সঙ্গে অবস্থান করতে পারে? সত্য কি মিথ্যার সঙ্গে সহ-অবস্থান করতে পারে?' (রোঁলার সঙ্গে কথোপকথন)। এম এন রায় এটাকে বলেছেন, 'দে আর পিওরলি মেটিরিয়ালিস্টিক ইন দ্য মোস্ট ভালগার সেন্স!' প্রকৃতপক্ষে তারা হল অত্যন্ত স্থূল ধরনের বস্তুবাদী। একদিকে বিমূর্ত স্রষ্টার চিন্তা অন্যদিকে শত শত মূর্তি উপাসনা, তত্ত্বে এবং প্রয়োগে সম্পূর্ণ বিপরীত এক চরম নৈরাজ্য সৃষ্টির উদ্যোগকে 'ধর্ম' দিয়েই প্রতিষ্ঠা করে। 'ঈশ্বরে মন সংযোগ করে যে কেউ শূকর মাংস ভক্ষণ করতে পারে, আবার হবিষ্যি খেয়েও কামিনী-কাঞ্চনে লিপ্ত থাকা যায়।' রামকৃষ্ণ ঠাকুরের এই কথামৃত নগ্ন ভোগবাদকে আড়াল করার চমৎকার উদাহরণ। 'ঈশ্বর চিন্তায় নিমগ্ন' এই রকম একটা অবস্থা তৈরি করতে পারলে যে কেউ নগ্ন ভোগবাদে আত্মমগ্ন থাকতে পারে এটা নিন্দনীয় নয়..... নীৎসের 'নিন্দাবাদ'-এর সঙ্গে (বিয়ন্ড গুড অ্যান্ড ইভিল) কী অপূর্ব সাদৃশ্য! তাই, ...

হিটলার যে রক্ত বা জাতি-শ্রেষ্ঠত্বের তত্ত্বের জন্য কুখ্যাত হয়েছে, সেটা কিন্তু সে পেয়েছে নীৎসের শাসক-শ্রেণীর প্রভুত্ব-কে যুক্তিসিদ্ধ করার দর্শন থেকেই। (তাঁর মতে যেহেতু সমাজকে টিকিয়ে রাখতে গেলে বহু কঠিন পরিশ্রমসাধ্য কাজের প্রয়োজন, সুতরাং একদল লোককে সেই কাজগুলো করার জন্য নীচু করে, অধীনস্থ রাখতেই হবে)। নীৎসে আবার এটা উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করেছেন শোপেনহাওয়ারের কাছ থেকে, যিনি আবার তাঁর যাবতীয় শান্তি খুঁজে পেয়েছেন গীতার ঐশ্বরিক চিন্তার মধ্যে, এবং উপনিষদের দর্শনে। অথচ এই দর্শনটা হাজার হাজার বৎসর ধরে ভারতে বর্তমান থেকেছে এবং ভারতীয় জনতাকে জীবনের রূঢ় বাস্তবতার মুখোমুখি হয়ে সাহসের সঙ্গে পরিবর্তন করার হিম্মতটা তার হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে। শোপেনহাওয়ারের দর্শনের মূল কথা 'ইচ্ছা-শক্তি', এর অবনতিকে তিনি সম্পূর্ণ মন্দ এবং হীন (ইভিল অ্যাণ্ড মীন) বলে চিহ্নিত করেছেন। অথচ এই ইচ্ছাশক্তি (বা হিউমান উইল) বস্তুটা কি? সমাজের প্রগতি এবং বস্তুগত বিকাশের সঙ্গে এর পরিবর্তন এবং ইচ্ছার মধ্যে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ব্যক্তিকে (ইচ্ছাশক্তি সম্পন্ন শক্তিধর) সামনে তুলে ধরে। একনায়কতন্ত্রের জন্ম দেয়। হিটলার থেকে ইন্দিরা ভায়া নেপোলিয়ন সকলেই হয়ে পড়ে 'ম্যান অব স্ট্রং উইল'! কী সেই 'উইল' সেটা আর দেখা যায় না।

আর্য দর্শন ইওরোপে কেন?

আসলে ব্যাপারটা কী ঘটেছে? শিল্পবিপ্লব এবং প্রকৃতি-বিজ্ঞানের অনুশীলন এবং বিকাশ পাশ্চাত্য জগৎকে এমন একটা অবস্থায় এনে পৌঁছে দিয়েছিল যেখানে একদিকে সম্পদের ওপর অধিকার নিয়ে সম্পদশালীদের মধ্যে দ্বন্দ্ব একটা চরম অবস্থায় পৌঁছে যায়। অন্যদিকে বঞ্চিতদের বঞ্চনা চরমে ওঠার ফলে নিজেদের পরিশ্রমের গুরুত্ব তাঁরা বুঝতে পারেন। শ্রম-জাত ফসলগুলোর মালিকানার প্রশ্নটা সামনে এসে যায়। সমগ্র পাশ্চাত্য জগৎ অন্তর্দ্বন্দ্বে ক্ষত-বিক্ষত, যুদ্ধ-বিগ্রহ বিক্ষোভে ভেঙে পড়ার মুখে। এই অবস্থায় তাদের এমন একটা দর্শনের প্রয়োজন হয়ে পড়ে যখন একজন সর্বময়-ক্ষমতা-সম্পন্ন ব্যক্তি তাদের হাল ধরতে পারে। একই সঙ্গে অন্যদিকে সাধারণ পরিশ্রমী মানুষকে 'শ্রম-জাত ফসল' থেকে দূরে সরিয়ে 'ফল' সম্পর্কে নিস্পৃহ করে তুলতে পারে। হিন্দু ধর্মের সর্বেশ্বরবাদ এবং 'মা ফলেষু কদাচন' এই তত্ত্ব তাদের কাছে মুক্তির বার্তা বয়ে আনে। কারণ এর দ্বারা এমন একদল মানুষ তৈরি করা যাবে যারা 'ফল' বিমুখ হয়ে কেবলমাত্র উৎপাদনই করে যাবেন। উৎপাদিত বস্তুর বণ্টন সম্পর্কে কোন 'আসক্তি' দেখাবেন না। যদিও তাদের মধ্যেও ঈশ্বরের অধিষ্ঠান আছে, তবুও তারা এই 'নিকৃষ্ট জীবন'কে মেনে নেন কারণ সেই অন্তরে-অধিষ্ঠিত ঈশ্বরই সেটা তাঁকে করার জন্য (ভোগান্তির জন্য) আদেশ করেছেন, কারণ এটা তার পূর্ব জন্মের পাপের প্রায়শ্চিত্ত—কর্মফল। হিন্দুদের জন্মান্তরবাদ এবং কর্মফল—নীৎসের ছোট কাজ করার জন্য একদল মানুষকে অধীনস্থ রাখার পক্ষে চমৎকার নৈতিক সাফাই। যেটাকে হিটলার তার জাতি- এবং রক্ত-তত্ত্বে বাস্তবায়িত করেছে।

অন্যদিকে 'স্ট্রং উইলে'র (প্রবল ইচ্ছাশক্তির) গুণগান একনায়কদের 'ভগবান-আদিষ্ট' ব্যক্তি হিসাবে চিহ্নিত করার যুক্তি। 'অন্যায় অবিচারে যখন পৃথিবী ভরে যাবে তখন আমি আবার আসি' (গীতাতে কৃষ্ণ)। স্বাভাবিকভাবেই এই অন্যায় অবিচার মানে মানুষের বিদ্রোহ এবং নিজেদের কোন অংশের কর্তৃত্বের দাবী। এই কাজে শঠতা, ক্রূরতা সবই ন্যায়। মহাভারতের যুদ্ধে কৃষ্ণের ভূমিকা কিম্বা রামায়ণের রাম। পাশ্চাত্যের বিত্তবানদের সামাজিক বিশৃঙ্খলা ঠেকানোর জন্য এই রকমই একজনের প্রয়োজন, যে চরম নিষ্ঠুরতা এবং দমন পীড়ন দিয়ে সমাজকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করতে পারে, যাতে নিরবিচ্ছিন্নভাবে তারা তাদের সম্পত্তি বৃদ্ধি করে যেতে পারে—কোন রকমভাবে সামান্যতম পরিশ্রম ছাড়াই শ্রমের ফলগুলোর মালিক হতে পারে। 'কৃষ্ণ' এবং 'রামে'র আদর্শ খুব সহজেই তাদের ইচ্ছা পূরণের হাতিয়ার। এরই জন্য হিটলারের মুখে, শোপেনহাওয়ারের বাণীর পুনরুক্তি 'আই অ্যাম অরডেনড্ বাই দ্যাট অলমাইটি টু লিবারেট দি আর্য ফ্রম জিউইজ অ্যাণ্ড কমিউনিস্ট মেনাস'। এই পৃথিবীটাকে ইহুদী এবং কমিউনিস্ট নষ্টামোর হাত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থেকে মুক্ত করার জন্য আমি সেই সর্বশক্তিমান দ্বারা আদিষ্ট পুরুষ (আত্মজীবনী : হিটলার)।

হিন্দুদের 'গুণ এবং যোগ্যতানুযায়ী চতুর্বর্ণ আমার-ই সৃষ্টি' (গীতাতে ভগবান)। 'শাসকরা (ব্রাহ্মণ এবং তাদের মিত্ররা) সম্পদ এবং কর্তৃত্ব করার অধিকার আমার কাছ থেকেই পেয়েছে, সেটা কেড়ে নেবার ইচ্ছা-পোষণ চরম পাপ এবং শাস্তি-যোগ্য (ব্রহ্মা)।'

'নির্গুণকে গুণের', নীচ জাতকে উচ্চ বর্ণের সেবা করতেই হবে। দাসদের মুক্তি দেওয়া উচিত নয়। কারণ তারা মুক্তির অযোগ্য। এখান থেকেই, ভায়া শোপেনহাওয়ার, নীৎসে পেলেন তাঁর বিখ্যাত তত্ত্ব 'এশিয়া আফ্রিকার বর্বর জনতাকে অধীনস্থ করা (আমদানী) যেতে পারে যাতে অসভ্য জগৎ সব সময় সভ্য জগতের সেবায় নিয়োজিত থাকে।' এমনি ভাবেই আর্যদের ভগবানের আদেশ (ধর্ম) জাতীয়তাবাদের সঙ্গে মিশে গেল। হিটলার দাবী করল, 'প্রত্যেক গতিশীল ধর্মকে অবশ্যই জাতীয় জোশের সঙ্গে মিশে যেতে হবে'। আমরা দেখলাম, সভ্য জাতির সেবা করার জন্য অসভ্য জাতকে অধীনস্থ করার যুক্তি। 'আর্যরা হচ্ছে সভ্য জাত (রেস)। সেই আর্যদের আদিভূমি জার্মানি। জার্মান খ্রীষ্টানদের মধ্যেই একমাত্র আর্য রক্তের বিশুদ্ধতা রক্ষা হয়েছে। সুতরাং সমগ্র বিশ্বকে জার্মান খ্রীষ্টানদের সেবাতে নিয়োগ করার কাজে কোন অন্যায় নেই, যে কেউ পৃথিবীতে থাকুক তাকে জার্মানদের অধীনে থাকতে হবে'। সরাসরি হিটলারকে উদ্ধৃত করেই বলা যেতে পারে, 'কেন, ভারতে আর্যরা কি সেই দেশ দখল করে শূদ্রদের দাস বানিয়ে রাখে নি? সুতরাং এই কাজে যে কোন বাধাকে নির্মমভাবে দমন করতে হবে কারণ সেটা ধর্মদ্রোহ। ব্যক্তিস্বাধীনতা, মতামত, অন্য দল, কিম্বা সংগঠিত হবার অধিকার এই নীতিতে অন্যায়।' যার শুরুটা খুঁজলে দেখা যাবে মনুসংহিতা এবং বেদান্তে। সুতরাং হিন্দু নেতা গোলওয়ালকার যখন বলে, 'এদেশে মুসলমানদের থাকতে হলে হিন্দুত্বকে মেনে, কোন রকম অধিকার ছাড়াই থাকতে হবে,' সে হিটলারের কথারই পুনরাবৃত্তি করে। 'দুটো জাত, দুটো সংস্কৃতি, একই সঙ্গে স্বাধীনভাবে থাকতে পারে না। একটাকে হয় পদানত হয়ে থাকতে হবে, না হয় ধ্বংস হতে হবে' (হিটলারের বক্তব্য)।

'হিটলারের কাছে থেকেই আমাদের শিখতে হবে কেমন করে একটা বিরুদ্ধ সংস্কৃতিকে উৎখাত করে জাতীয় সংস্কৃতির বিশুদ্ধতাকে রক্ষা করতে হয়। তার সময়েই জার্মান জাতি হিসাবে চরম উৎকর্ষ লাভ করেছিল।' হিন্দু নেতা বালথ্যাকারে হিটলারের প্রতি হিন্দুত্বের কৃতজ্ঞতা স্বীকার করেছে, সরাসরি।

সুতরাং ফ্যাসিবাদ বলতে আমরা যা বুঝে থাকি একদিকে ব্যাপক মানুষকে অধীনতা স্বীকার করে নিতে বাধ্য করা, অন্যের জন্য পরিশ্রম করতে অত্যাচার করা, বল প্রয়োগ করে কণ্ঠস্বর স্তব্ধ করে দেওয়া (চার্বাকের জিব কেটে নেওয়ার ঘটনা স্মরণ করুন)। অন্যদিকে এই দুনিয়াকে 'মায়া', 'ভ্রম' বলে বিশ্বাস করে 'আমি আদেশপ্রাপ্ত' বা নিমিত্তমাত্র চিন্তার থেকে মানসিক কৈফিয়ত খাড়া করা, যার ফলে 'চরম ভোগবাদ'কে (নগ্ন) বল্গাহীনভাবে বেড়ে যেতে দেওয়া.....। পণ্য উৎপাদক সমাজ এটাই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চায়.....তাহ'লে মানুষকে পণ্যপূজারী করে তোলা যাবে। হিন্দুদের সর্বেশ্বরবাদই (সর্ব ভূতে ভগবান) এর উৎস। এই কাজে যুক্তির জায়গা নেয় কুযুক্তি (কুযুক্তি যুক্তিহীনতার চেয়েও মারাত্মক), বিজ্ঞানের জায়গা নেয় উদ্দেশ্যমূলক ধারণা। ইতিহাসের উপাদান হিসাবে হাজির হয় 'বীরগাথা' এবং 'অতিকথনগুলো', সেগুলোকেই 'ঐতিহ্য' বলে চালিয়ে মানুষকে শর্তাধীন করে তোলা হয়। 'প্রাচীন রোম সাম্রাজ্যের ঐতিহ্য পুনরুদ্ধার' কিম্বা 'মহান জার্মান জাতির অতীত ফিরিয়ে আনো' 'বৃহত্তর প্রুশিয়ান সাম্রাজ্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠা' এগুলোই ছিলো মুসোলিনি, হিটলারের স্লোগান। সুতরাং প্রাচীন ঐতিহ্যের প্রতি মমতা দেখিয়ে প্রলুব্ধ করাটা ফ্যাসিবাদকেই আসতে সাহায্য করে।

মানসিকভাবে ফ্যাসিস্ত একদল মানুষকেও দেখা যায় যাঁরা এই স্লোগানটাকে ব্যবহার করে থাকেন। লেনিনের উদ্ধৃতি দিয়ে তাঁরা নিজেদের যুক্তি সমর্থন করেন। অত্যন্ত বিপজ্জনক কথা। হ্যাঁ লেনিন বলেছেন, প্রাচীন ঐতিহ্য বা সংস্কৃতিকে সংরক্ষণ করতে হবে। কিন্তু কোথায়? যাদুঘরে। এই মানুষগুলো লেনিনের কথার সেটুকু বলেন না। কেন? যাতে আমরা বুঝতে পারি সেই যুগটাকে, দেখাতে পারি সেই যুগের সীমাবদ্ধতা। এমনি ভাবেই অতীতের সীমাবদ্ধতাগুলোকে উপহাস্য করে তুলতে পারি। সেগুলোর প্রতি করুণা বা 'সেই সে দিন কত সুখের ছিল ' বলে লালসাগ্রস্ত করে তোলার জন্য লেনিন বলেন নি।

এক কথায় একদল মুষ্টিমেয় লোকের স্বেচ্ছাচারিতা, বর্বরতা এবং প্রভুত্বের জন্য ব্যাপক মানুষকে খুন করার যে যুক্তিটা ধর্ম মানুষের রক্তে ঢুকিয়ে দিয়ে থাকে ফ্যাসিবাদ এসে সেটাকে সংগঠিতভাবে বাস্তবায়িত করে। তাই হিটলার বলতে পারে, 'সেই ধর্মের কী প্রয়োজন যেটা বাস্তবায়ন করা যাবে না।' উপনিষদ থেকে নেওয়া হিটলারের 'স্বস্তিকা' ধর্মের বাস্তবায়নের পতাকা।

তাই ফ্যাসিবাদ মানে ধর্ম এবং রাষ্ট্রের একীকরণ। ব্যাঙ্কের পুঁজি এবং উৎপাদকদের পুঁজির একীকরণ যেমন একটা বিশেষ অর্থনৈতিক অবস্থার সৃষ্টি ক'রে একটা সর্বময় কর্তৃত্বের অবস্থা তৈরি করে। ধর্ম এবং রাষ্ট্রের এই মিলে যাওয়াটাও একটা সর্বাধিনায়ক প্রভু সৃষ্টির সামাজিক সংগঠন তৈরি করে থাকে। যে কোন আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থাতেই সেটা হতে পারে। তার সেই সময়কার নামটা হয়তো বা অন্য কিছু থাকে।

এই অবস্থাতে ইতিহাসের বিকৃতি এবং উদ্দেশ্যমূলক ইতিহাস রচনার জন্য চেষ্টা করা হয়। ধর্মের ওপর নির্ভর করে জাতীয় 'হিরো' সৃষ্টি হয়ে থাকে।

আমাদের দেশে যেমন দেখতে পাওয়া যাচ্ছে—আকবর, গুরু নানক, কবীর থেকে শুরু করে তাঁতিয়া টোপী, কুঁয়ার সিং, মঙ্গল পাণ্ডে কিম্বা সিধু, কানু, সূর্য সেন, বেগম হজরত কেউই জাতীয় হিরো নন। জাতীয় হিরো রানা প্রতাপ, শিবাজী, গুরুগোবিন্দ এঁরা। লক্ষ্যটা পরিষ্কার, মুসলিম বিরোধিতাকেই জাতীয়তাবাদের মাপকাঠি ধরা হয়েছে। ইংরেজ বিরোধিতাকে নয়। জাতীয়-টাই এই জাতীয়তাবাদে সাম্প্রদায়িক হয়ে পড়ে। বিদেশী শাসকদের আনুকূল্যে এই জাতীয়তাবাদ বেড়ে ওঠে। এবং দ্রুত ফ্যাসিবাদী চরিত্র ধারণ করে থাকে। সুতরাং 'সর্বেশ্বরবাদ, এবং মায়াবাদ-জাত ভোগবাদ, সৃষ্টি-নিরপেক্ষ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্রষ্টা চিন্তা, বর্ণভেদ, জাতি-শ্রেষ্ঠত্ব তত্ত্ব ইত্যাদি ফ্যাসিবাদের সমস্ত উপাদানগুলোই ভারতীয় সমাজে হাজার হাজার বছর থেকে গেছে, তাই, 'হিন্দুত্ববাদীরা রাজনৈতিক ক্ষমতাটা লাভ করতে পারলেই এদেশে তার চিরাচরিত (টিপিকাল) রক্তাক্ত নখ এবং দাঁত দিয়েই ঝাঁপিয়ে পড়বে পণ্য উৎপাদকদের সামাজিক প্রভুত্ব কায়েম করার কাজে'। আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদী শক্তি এক্ষেত্রে তার পৃষ্ঠপোষক।

হিটলারের জার্মান আর্যদের সেবায় সমগ্র দুনিয়াকে কাজে লাগানোর উদ্দেশ্যে কমিউনিস্ট এবং ইহুদী নিধনের ধারা বেয়ে ভারতবর্ষকে ব্রাহ্মণ্যবাদী কর্তৃত্বের অধীনস্থ করার জন্য বি-জে-পি প্রভৃতি সংগঠনের মুসলিম নিধন একই পর্যায়ের। এর উৎসটা যে গীতায় আছে, সেটা (১৪/১/৮৯) 'টেলিগ্রাফ' কাগজে প্রকাশিত স্বামী চিন্ময়ানন্দের ভাগলপুরে মুসলিম নিধনের সমর্থনে গীতার শ্লোক ব্যবহারে দেখা যায়।

হিন্দুধর্মে শূদ্র বা শ্রমজীবী মানুষের অবস্থান

হিটলারের 'জাতি'-শ্রেষ্ঠত্বের তত্ত্ব এসেছে, আর্যদের শাসন-বিধির আকর গ্রন্থ মনু থেকে। মনু সংহিতার বিভিন্ন পর্বে শূদ্র এবং নিম্নবর্ণী (জাত)-দের সম্বন্ধে যা বলা হয়েছে সেগুলো এক জায়গায় করলে সংক্ষেপে যা দাঁড়ায়ঃ—

(১) শূদ্ররা, কাক, ব্যাঙ, পাখি, ব্যাঙাচি অথবা ভারবাহী পশুদের সমগোত্রীয় এবং সেই সব প্রাণীদের মতই তাদের অস্পৃশ্যতাগুলো প্রকট।

(২) শূদ্রদের যদি কোন উচ্চবর্ণের মানুষ ঠকিয়ে সম্পত্তি এবং সম্পদ থেকে উৎখাত করে সেটা দোষের নয়।

(৩) শূদ্রদের কোন সময়েই এমন পরিমাণ সম্পদ জমাতে দেওয়া হবে না, যাতে তারা প্রাচুর্যে থাকতে পারে এবং আত্মনির্ভর ও স্বাধীন হয়ে যেতে পারে (নীৎসে লক্ষণীয়)।

(৪) প্রত্যেকটা বর্ণের মানুষকেই বিভিন্ন হারে রাজকর দিতে হবে, কিন্তু যত নীচু জাতের মানুষ হবে, করের হার তত বেশি হবে।

(৫) ছোট-জাতের ওপর বেশি রাজকর নির্ধারণ রাজার কর্তব্য (আওরঙ্গজেবের জিজিয়ার ধারণা কি এখান থেকেই?)।

(৬) যদি কোন শূদ্র কোন উচ্চবর্ণের মহিলাকে ধর্ষণ করে তাহলে তাকে লিঙ্গচ্ছেদ সহ মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার বিধান আছে। কিন্তু কোন উচ্চবর্ণের মানুষ (ব্রাহ্মণ) এই কাজ করলে, সম্পত্তিসহ তাকে নির্বাসন দিলেই হবে।

(৭) শূদ্রের সাক্ষ্য সাধারণভাবে গ্রহণযোগ্য নয়, কারণ, নারী এবং শূদ্ররা কখনই সত্য কথা বলে না।

এরই জন্য রামচন্দ্র শম্বুককে উপাসনারত অবস্থায় হত্যা করে বলেন, 'ভগবান মনু কী এই কাজ করতে বলেন নি?'

AMARBOI.COM

শূদ্রদের শাস্তির বিধান

আর্য্য সাহিত্য এবং দর্শনগুলোতে নিম্নজাতদের যে সমস্ত শাস্তির বিধান দেওয়া হয়েছে আশ্চর্যজনকভাবে সেগুলোর হুবহু প্রয়োগ দেখা গেছে হিটলারের কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে—

(ক) ব্রাহ্মণ সম্পর্কে যদি কোন শূদ্র খারাপ কথা বলে তার জিব কেটে নাও। সে যদি বাকি তিনটে উচ্চবর্ণের সমান মর্যাদা দাবী করে, প্রকাশ্য রাস্তায় তাকে চাবুক মারো (ধর্মসূত্র III 10-26)

(খ) শূদ্রদের শিক্ষা দিও না। বেদ-শিক্ষা তো নয়ই। (ডঃ শহীদুল্লাহকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সংস্কৃত বিভাগে ভর্তি হতে দেয়নি।) শিক্ষার একচেটিয়া অধিকার নিজেদের কর্তৃত্বে রাখার নির্দেশ।

(গ) যদি কোন শূদ্র বেদ উচ্চারণ শুনে ফেলে, রাজার উচিত তার কানে গরম গলা সীসে ঢেলে দেওয়া। (মনু)

(ঘ) যদি কোন শূদ্র কোন ব্রাহ্মণকে ধর্ম সম্বন্ধে জ্ঞান দেবার ঔদ্ধত্য দেখায়, তার মুখে এবং কানে ফুটন্ত তেল ঢেলে দেওয়া উচিত।

সংক্ষেপে

হিন্দু ধর্মের মূল কথাঃ

(১) বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে বৈষম্যকে যুক্তিসিদ্ধ বলে ঘোষণা করে তাদের ত্রিস্তর কর্তৃত্বের নিদর্শনঃ-

"দেবাধীনং জগৎ সর্বং
মন্ত্রাধীনং তে দেবতাঃ
তং মন্ত্রং ব্রাহ্মণাধীনং
ব্রাহ্মণ নাম দেবতা।"
বিশ্বব্রহ্মাণ্ড দেবতাদের অধীন
দেবতারা মন্ত্রের অধীন
সেই মন্ত্র আবার ব্রাহ্মণের অধীন
সুতরাং ব্রাহ্মণরাই দেবতা

(২) শূদ্র এবং অস্পৃশ্যদের সম্পূর্ণভাবে নিরস্ত্র করা।

(৩) শূদ্র এবং অস্পৃশ্যদের জন্য শিক্ষার দরজা বন্ধ করে দেওয়া।

(৪) সরকারি কর্তৃত্বের স্থানগুলোতে শূদ্র এবং অস্পৃশ্যদের নিয়োগ নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করা।

(৫) মহিলাদের সম্পূর্ণভাবে অধীনস্থ রাখা।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে ফ্যাসিবাদের সবগুলো দিকই ধর্মের মধ্যেই আছে। ধর্মের পারলৌকিক চিন্তা থেকে শুরু করে ঐহিক আচার সব কিছুই মানুষকে ফ্যাসিস্ত কর্মধারাতেই অনুপ্রাণিত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করে। কারণ 'ধর্ম' বিশ্বাস তখনই সাম্প্রদায়িক হয়ে পড়ে যখন কেউ ভাবতে থাকেঃ- (ক) আমার ধর্মই সর্বোৎকৃষ্ট। (খ) এই ধর্মীয় সংস্কৃতির বিপরীত সবগুলোই ঘৃণার যোগ্য। (গ) সব মানুষেরই আমার ধর্ম গ্রহণ করা এবং তার সেবা করা উচিত কারণ (ঘ) নিকৃষ্টরা চিরকালই উৎকৃষ্টদের পদানত থাকে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ফ্যাসিবাদের উৎস সন্ধানে: ইসলাম ধর্মে

পাশ্চাত্য যখন অন্তর্দ্বন্দ্বে ক্ষত-বিক্ষত, সামাজিক সংগঠন এবং প্রচলিত জীবনবোধগুলো ধ্বংসের মুখে, সেই সময় সেখানকার চিন্তাবিদদের একদিকে সান্ত্বনা, অন্যদিকে সমাজকে ধরে রেখে সামাজিক উৎপাদনে সরাসরি যুক্ত নয় যে সম্প্রদায়গুলো উৎপাদনের বিভিন্ন অংশ তাদের মধ্যে ভাগ করে দেবার (যার মধ্যে তাঁরা নিজেরাও পড়েন) সংগঠন এবং পরিকাঠামোটা অক্ষত রাখা এবং শক্তিশালী করার জন্য একটা দর্শনের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। ধর্মই পারে একই সঙ্গে দুটো কাজ করতে। নিজেদের দেশের ধর্মের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে তখন তারা বিদেশ-এর ধর্মমত গুলোতে আশ্রয় খোঁজে।

সরাসরি হিটলারের আর এক মন্ত্রগুরু কার্লাইলকে দেখতে পাই 'ইসলাম' ধর্মের গুণ-গানে মুখর হয়ে উঠেছেন। তার কারণ 'ইসলামে'র মধ্যে একটা সামঞ্জস্য এবং ধারাবাহিকতা তিনি লক্ষ্য করেছেন। পরস্পর-বিরোধী বাক্যজালের ধোঁয়াশা সৃষ্টির প্রচেষ্টা সেখানে নেই। 'একটা গোটা রাত্রির এবাদতে'র (স্রষ্টা চিন্তা) চেয়ে একটা ঘন্টা এই পৃথিবী (সৃষ্টি) সম্পর্কে চিন্তা অনেক বেশি 'নেকি'র (পুণ্যের) কাজ। ইসলামের এই চিন্তার চমৎকারিত্বে তিনি মুগ্ধ।

হিন্দু ধর্মে যেমন 'স্রষ্টা' সম্পর্কে চিন্তাটাই প্রধান। ইসলামে প্রাধান্য পায় 'সৃষ্টি' সম্পর্কে চিন্তা। 'ভোর হচ্ছে' কুয়াশা [illegible] করে সূর্যের রক্তিম আভা পশ্চিম দিকের আকাশকে লাল করে দিচ্ছে। পূব [illegible] পশ্চিম, উত্তর থেকে দক্ষিণ, চাঁদের বিদায়, সূর্যের উদয়....., 'এই [illegible] আমার সৌন্দর্য! এগুলো দেখেও তুমি আমাকে অস্বীকার করবে?' অর্থাৎ ইসলামে স্রষ্টা সৃষ্টির মধ্যেই নিজের কর্তৃত্ব এবং অস্তিত্ব জাহির করতে চান? হিন্দু ধর্ম যেমন স্রষ্টার বিমূর্ত চিন্তার ধোঁয়াশা থেকে সবই ঈশ্বর চিন্তা করে নিয়ে মূর্তি পূজার পরিণতিতে পণ্য-উৎপাদক সমাজের জন্য পূজা এবং ভোগবাদে নিজেকে প্রকাশ করেছিলো, ইসলাম সৃষ্টি পূজা (অনুশীলন) থেকে বিপরীতে বিমূর্ততে পৌঁছে গিয়েছিলো। সীমা থেকে অসীমে অতিক্রমণেই গণ্ডগোল ঘটে যায়। চরম অভিজ্ঞতাবাদ থেকে তার যাত্রা শুরু। পরবর্তী যুগের পণ্য-পুজোর কাজ যার মধ্যে নিহিত থাকে। সুতরাং কার্লাইল যে অসামঞ্জস্যহীনতার জন্য ইসলাম ধর্মের গুণগান করেছেন আসলে হিন্দু ধর্মের মতই সেটা বৈপরীত্যে ভরা। আধ্যাত্মিক সিদ্ধান্তের সঙ্গে ঐহিক পালনীয় কর্তব্যে কোন মিল নেই। কোন সাদৃশ্য নেই। আসলে ইসলামের যেটি তাঁর ভালো লেগেছে, সেটা হচ্ছে: ইসলাম, না-বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের ক্ষেত্রে, না জাগতিক ক্ষেত্রে কোথাও কোনও 'শেরেক' বা অংশীদার স্বীকার করে না। সেই জন্য 'আল্লা' শব্দটার কোন পরিভাষা পৃথিবীর কোন ভাষাতেই নেই। ভগবান হলে তার স্ত্রীলিঙ্গ হয় ভগবতী, ঈশ্বর হলে ঈশ্বরী, তাহলে আল্লা বা খোদার সর্বশক্তিমত্তা খর্ব হয়ে যায়। শক্তির বিভাজন হয়ে যায়। ইসা বা যীশুকে ইসলাম স্বীকৃতি দেয়,

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিন্তু কখনই ভগবানের পুত্র হিসাবে নয়। কারণ পুত্রের ধারণার সঙ্গে অংশ এবং উত্তরাধিকারের প্রশ্নটা জড়িত। খ্রীষ্টানদের সঙ্গে মুসলমানদের বিরোধের এই 'ধর্মীয় সূত্র'.....বছরের পর বছর, আধিপত্য বিস্তারের (পৃথিবীতে) রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে ইন্ধন জুগিয়ে গেছে। 'লা-শরিকাল্লাহ'! 'আমার কোন শরিক নেই, নেই পিতা, পুত্র, আমি ও কারোর পিতা নই'.....আমি কর্তা, আমি স্রষ্টা। আমি ছিলাম, আছি, থাকবো।

পৃথিবীর ওপর একচেটিয়া আধিপত্য বিস্তারের জন্য এই রকম একটা চিন্তা আধিপত্যকামীদের কাছে গ্রহণযোগ্য তো হবেই।

আল্লা যতই বলুন, 'আমার এবং মানুষের মধ্যে আমি কোন অছি (মধ্যম ব্যক্তি বা গোষ্ঠী) নিযুক্ত করিনি.....'(কোরান)। [কোরানের এই আয়েত-টার ওপর ভিত্তি করেই সরাসরি আল্লার সান্নিধ্য পাবার জন্যই ইসলামী ভক্তিবাদ বা সুফি মতবাদ গড়ে ওঠে], কিন্তু কেউ যদি শুধু এইটুকু বলে, শুধু বলে, 'লা-ঈ লাহা ইল্লাল্লাহ্' সে কি মুসলমান হবে? কোরান, হদিশ সকলেই বলছেন, এমন কি সুফিরা পর্যন্ত, 'না, আল্লা একটাই' এটুকু বললেই মুসলমান হওয়া যায় না। সঙ্গে সঙ্গে বলতে হবে, 'মহম্মদ রসুল্লাহ্' 'মহম্মদ তাঁর রসুল বা দূত'। কোরানের ব্যাখ্যাতে তো বটেই, হদিশের বিভিন্ন সময়কার, বিভিন্ন ধর্মপ্রাণের উক্তিতে পরিষ্কার নির্দেশ দেওয়া আছে: 'মহম্মদকে না মেনে আল্লাহকে মানা যায় না'। তাহলে দেখা যাচ্ছে 'সর্বেশ্বরবাদ' এবং 'একেশ্বরবাদ' দু'টোই জাগতিক প্রয়োগের ক্ষেত্রে মূর্ত ব্যক্তি কর্তৃত্ববাদকেই হাজির করছে। ইসলাম ধর্মে অননুগামিতার কোনোটিতম স্থান নেই। অননুগামী মানেই কাফের। কোরান শরীফের (৩০ 'পারা') অর্ধেকের বেশি অংশ জুড়ে শুধু তাদের শাস্তির ভয় দেখানো হয়েছে। খোদার 'লানৎ' কী ভয়ঙ্কর: মলমূত্র ভক্ষণ করানো থেকে আগুনে পুড়িয়ে মারা, গদা পেটা করা, কী নেই সেখানে। কোরানের নির্দেশানুযায়ী না চললে মরার পর 'গোরে আজাব' (কবরের মধ্যে শাস্তি) দিয়ে শুরু হয়ে যাবে সেই নির্যাতন। [এ-যেন ধরা পড়ার পর বিপ্লবীদের থানা লক্ আপে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই ডাণ্ডা হাতে সেপাই-এর অভ্যর্থনা, 'কী বে শালা' বিপ্লব মারাবে না!']। তারপর সেটা চলবে.....চলতেই থাকবে কেয়ামত পর্যন্ত (শেষের সেই পুনরুত্থানের দিন)। সেই দিন সকলকেই জজ সাহেবের সামনে আসামীর মত হাজির হতে হবে। বিচারের ফাইনাল জাজমেন্টের সেই দিনটা যে কবে হবে কেউ বলতে পারে না। [ভারতীয় বিচার-ব্যবস্থায় বিচারাধীন করে 'পঁচিশ বছর ফেলে রাখা'-কে এরপর আর দোষারোপ করা যায় কি?] মৃত্যুর পর থেকে পুলিশ হাজতে বছরের পর বছর কাটাতে হবে অনন্তকাল। ততদিন অননুগামীদের সওয়াল চলতেই থাকবে আর নানা ধরনের শাস্তি (নাৎসী ক্যাম্পের বিভিন্ন বর্ণনার সঙ্গে এই শাস্তির বহরগুলো উৎসাহী পাঠকরা মিলিয়ে নেবেন। আমার যৎ-কিঞ্চিৎ অভিজ্ঞতা আছে.....)।

তারপর শেষের সেই দিন কী ভয়ঙ্কর! নীচে ফুটন্ত লাভার (সীসের) স্রোতস্বিনী, তার ওপর চুলের মত সরু সাঁকো। ওপারে পৃথিবীর আজ পর্যন্ত জন্মানো সমস্ত

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মানব মানবী। তাদের সংখ্যাটা কত হতে পারে ভাবুন তো? বলা হয়েছে খোদার পেয়াদা যখন প্রত্যেকটা মৃতের নাম ধরে কবর বা মৃত্যু থেকে উঠে আসার আহ্বান জানাবে [যেমন কোর্টে পেয়াদা হাঁক পাড়ে—অমুক আসামী হাজির?] এক একটা কবর থেকে সাতশ' (মতান্তরে সত্তর) জন একই নামের লোকের অভ্যুত্থান ঘটবে। এখান থেকে পারম্যুটেশন, কম্বিনেশন করে হাজতবাসের মেয়াদটা আন্দাজ করতে পারা যায় মাত্র। অর্থাৎ যখন একটা কবরে সত্তর বা সাতশ'জন একই নামের লোক কবরস্থ হয়ে যাবে তখন। কবরগুলো ভরে যাবে মাটি পড়ে। এর মাঝখানে নতুন কবরের জায়গা তৈরি হবে। কত অন্য নামের লোকও সেখানে কবরস্থ হবেন। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে অতজন একই নামের লোকের কত বছর সময় লাগতে পারে সেটা এবার প্রত্নতাত্ত্বিকরা ভাবুন! [সাবাস! কদিনের এই পুলিশ হাজত!]

পরম বিচারক প্রত্যেককে ডাকবেন ঐ সাঁকো পার হয়ে তাঁর সামনে হাজির হবার জন্য। যারা পাপী তারা পার হবে কী করে? আতঙ্কে কান্নাকাটি করবে। পেছন থেকে লোহার কাঁটা দেওয়া ডাণ্ডা হাতে খোদার পেয়াদা তাকে পেটাতে পেটাতে তার অননুগামিতার ফিরিস্তি শোনাতে থাকবে। সে সাঁকোতে ওঠার (পুল সুরাত) চেষ্টা করবে এবং পড়বে। অদ্ভুত একটা ব্যাপার সব ধর্মেই, বিদ্রোহীকে শাস্তি দেবার বিধানগুলোর মধ্যে এই জ্বলন্ত সীসে বা লাভা আর আগুনের ভয় দেখানো হয়েছে। [এটা কি পৃথিবীর আদিম রূপের (জ্বলন্ত) সম্পর্কে মানুষের মস্তিষ্কে সঞ্চিত আতঙ্ককে কাজে লাগানো?] অনুগামী বা পুণ্যবানরা সাঁকোটা দেখবেন প্রশস্ত সেতু। সহজেই পার হয়ে যাবেন। ইসলামে এই 'পাপ' বা অননুগামিতা মলমূত্র ত্যাগ করা থেকে স্ত্রী-সহবাস পর্যন্ত বিস্তৃত। কারণ সব প্রশ্নেই 'ইসলাম' নির্দিষ্ট করণীয় বাতলে দিয়েছে। পদে পদে নির্দেশ এবং অমান্য করলে কী পরিমাণ শাস্তি হবে তার হুমকি। সত্যি কথা বলতে কি প্রকৃত ইসলাম অনুরাগী একজন ভক্ত, অক্ষরে অক্ষরে ইসলাম মানতে গেলে আতঙ্ক-রুগী (ফিয়ার সাইকোসিস) হতে বাধ্য।

না, এত ভয় পাবার কিছুই নেই, আল্লাহ্ আবার পরম করুণাময়। মঙ্গল করাই তাঁর কাজ। আনুগত্যটা পেলেই হলো। পার্থিব বস্তুতে লোভ নেই, কারণ সবই তো তাঁর। আনুগত্যটা পেলেই তাঁর করুণা ঝরবে ঝর ঝর করে। (সুতরাং মন্ত্রীরা যে অনুগতদের প্রতি দয়া দেখান তাকে দুর্নীতি বা স্বজন-পোষণ বলা উচিত হবে কি কোন মুসলমানের?)

হিন্দু ধর্মের মতই মুসলমান ধর্মের আল্লাহ দাবী করছেন, সমস্ত কিছুই তিনি করান বা করাচ্ছেন। 'আমার হুকুম ছাড়া গাছের একটা পাতাও নড়তে পারে না।' তাই না ওমর খইয়াম প্রশ্ন তুললেন, 'এই যে আমি সুরা-সাকী নিয়ে মত্ত থাকি, তোমার এবাদত করার সময় পাই না, এটাও তো তোমার হুকুমেই হচ্ছে কারণ তোমার হুকুম ছাড়া তো এই পৃথিবীতে কিছুই হবার নয়।' দার্শনিক বিজ্ঞানী এই কবির কী হাল হচ্ছে জানি না। তবে আল্লাহ্ আবার খেদ করে বলেছেন, শয়তানের প্রলোভনে পড়েই তো সব গুলিয়ে গেছে। প্রশ্ন উঠতে পারে, শয়তানও তো তাঁর ইচ্ছাতেই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সৃষ্টি হয়েছে। শয়তানের প্রলোভন দেখানোটাও তাঁর ইচ্ছা। মানুষের স্বর্গচ্যুত হওয়াটাও তাই, এই রকমভাবে ভালোমন্দ সবই একই ইচ্ছাতে বিলীন। সেই নীৎসের 'নিন্দাবাদ', বিবেকানন্দের 'ভালো-মন্দ' ব্যাপারটা বোধের (নিম্নস্তরের) ব্যাপার, সেখান থেকে উত্তরণটাই আসল কথা। 'বিয়ন্ড গুড অ্যান্ড ইভিল!' হিটলারি দর্শনের প্রারম্ভিক বিন্দু।

তাহলে দেখা যাচ্ছে আতঙ্ক সৃষ্টি করে আত্মসমর্পণ করার মূল নীতিতে দুটো ধর্মই এক। উদ্দেশ্য পরিষ্কার, মহাজগতের কর্তৃত্বের যেমন শরিক নেই, আল্লার যেমন শরিক নেই ইহ জগতেও শাসকদের সেই রকম শরিক থাকতে পারে না। সুতরাং যাঁরা শরিকশূন্য কর্তৃত্ব চান, ইসলাম তাদের ক্ষেত্রে ভালো যুক্তি সরবরাহ করে থাকে।

বরং বলা যেতে পারে ইসলামে এই আতঙ্ক সৃষ্টিটা অনেক সুসংবদ্ধভাবে, সংগঠিতভাবে করা হয়েছে। তাই আল্লাহ্‌কে সামনে বসিয়ে ইসলাম গড়ে উঠেছে একটা সুসংগঠিত সংগঠন হিসাবে। এই বিশাল ইমারত যার ভিতের ইট আর উপরের ছাদ একটা কাঠামোর মধ্যেই ধরা আছে। এই কেন্দ্রীভবনটাই গিবন থেকে এম এন রায় প্রত্যেককেই আকৃষ্ট করেছে। ইসলামে রাষ্ট্রের দমনমূলক চরিত্রকে আশীর্বাদ বলে বলা হয়েছে। রাষ্ট্র সম্পর্কে এত নির্দিষ্টভাবে, এবং কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্রের ধারণা আর কোন ধর্মেই এত পরিষ্কার ভাবে দেখা যায় না।

'আমি আমার নবীদিগকে সুস্পষ্ট বিধান সহ প্রেরণ করিয়াছি। কিতাব এবং মিযান (জুরিসপ্রুডেন্স)-ও দান করিয়াছি। ইহার সাহায্যে তোমরা সুবিচার (এবং ইনসাফ) প্রতিষ্ঠা করিতে পারিবেন। লোহাও দিয়াছি। ইহাতে প্রচণ্ড শক্তি এবং মানবের অশেষ কল্যাণ নিহিত রহিয়াছে। (কোরান)'

এই 'লোহা' কথাটার মানে বলপ্রয়োগ, coercive power। রাষ্ট্রের এই (coercive power) বা দমনমূলক চরিত্রের মধ্যে কল্যাণের চিন্তা হিটলারের শক্তিশালী কেন্দ্র এবং রাষ্ট্রপূজোর তত্ত্বের কত কাছাকাছি!

উৎস সন্ধানে

এই সুসংগঠিত একটা কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রের ধারণাটা সেই সময় এলো কোথা থেকে? সেই সময়কার আরবদেশকে বুঝতে পারলে বোঝা যাবে, কেন ইসলাম ধর্মের আবির্ভাব 'শান্তি' (ইসলাম)-কে কেন্দ্রীয় স্লোগান হিসাবে রাখে। পৃথিবীতে আর কোন ধর্মই ঐহিক জীবন নিয়ে এত মাথা ঘামায় নি। ব্যক্তি-মানুষের দৈনন্দিন জীবনকে আর কোন ধর্মই এত নিয়ন্ত্রিত করতে পারে নি। এই রেজিমেন্টেশনের কারণ বুঝতে গেলে বুঝতে হবে আরবকে। একটা বিশাল ভূখণ্ড, কোন উৎপাদন নেই বললেই চলে। (তখনও মাটির তলার সম্পদ আবিষ্কারের মত জ্ঞান বিজ্ঞান মানুষের আয়ত্তে আসে নি।) পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ব্যবসা করে তাদের চলে। তাও নিজেদের উৎপাদিত পণ্য সেখানে থাকে না বললেই হয়।

সমুদ্র- এবং স্থল-পথেই তাদের যাতায়াত। জনসংখ্যার অধিকাংশ মানুষই কার্যত বেকার। এক-একজন বেনিয়াকে কেন্দ্র করেই তারা সংগঠিত। রাস্তা-ঘাটের নিরাপত্তা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এবং অন্য বেনিয়ার সঙ্গে কর্তৃত্বের লড়াইয়ে জেতার জন্য তাদের জনগণকে নিজেদের মধ্যে সংগঠিত করতে হয়। ছোট ছোট বেনিয়াকে কেন্দ্র করে গড়ে-ওঠা এই সমস্ত জনগোষ্ঠী পৃথক পৃথকভাবে নিজেদের একটা বিশ্বাস এবং আচার গড়ে তোলে।

অন্যের মাল লুট করা, ব্যবসায় প্রতিদ্বন্দ্বিতার স্বীকৃত নীতি। ফলে বেনিয়াদের নেতৃত্বে বিভক্ত বিভিন্ন জনগোষ্ঠী দ্বন্দ্ব এবং রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে লিপ্ত থাকে। সমগ্র সমাজটাই সংঘর্ষ এবং রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে জীর্ণ হয়ে পড়ে।

সেদিনকার আরবদেশে, বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষ, দ্বন্দ্ব এমন একটা পর্যায়ে পৌঁছায় যে পুরুষ, নারীর অনুপাত প্রায় ২৫:৭৫ হয়ে যায়। ঘরে ঘরে বিধবা। 'শান্তি' এবং 'সংখ্যাবৃদ্ধি'র আকাঙ্ক্ষা মানুষের একমাত্র কাম্য হয়ে ওঠে।

এই অবস্থার মধ্যে শৈশবেই পিতৃ-মাতৃ-হারা অসম্ভব কবিত্ব-শক্তি সম্পন্ন এক শিশু বেড়ে উঠতে থাকেন। আবেগ আছে, কিন্তু প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা পাবার কোন সুযোগ নেই। মারামারি, হানাহানি, লুটতরাজে দীর্ণ মানুষগুলোকে ঐক্যবদ্ধ না করতে পারলে, তারা ধ্বংস হয়ে যাবে। এই ঐক্যের জন্য মানুষের আকাঙ্ক্ষাটাকেই তুলে ধরতে হবে। সেটা হল শান্তি। হানাহানি বন্ধ করতে হলে চাই সাম্য এবং ভ্রাতৃত্ববোধ। কিন্তু সেটা কী করে সম্ভব? বেনিয়া সমাজপতিরা (শেখ) মানুষগুলোকে এক একটা দেবতার অধীনে নিজেদের কর্তৃত্বে গোষ্ঠীবদ্ধ করে রেখেছে। নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য। এক বেনিয়া, অন্য বেনিয়ার বিরুদ্ধে তাদের সংঘর্ষে লিপ্ত করছে। সেগুলোর নৈতিক সাফাই হিসাবে আছে 'দেবতা'। বহুবচনিক সমাজের ফলেই দেখা যায় 'বহু দেবতা'। 'বহু দেবতা'র কাছে আত্মসমর্পণের ফলে সমাজ বিভক্ত। সুতরাং এঁদের একটা শক্তির উপাস্য করে তুলতে পারলে ঐক্যবদ্ধ হবার একটা মানসিক ভিত্তি তৈরি হয়ে যায়।

তাই, অনিবার্য ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচতে গেলে প্রয়োজন 'শান্তি'র স্লোগান, কারণ মানুষ এটাই চান। বিশেষ করে যে-অঞ্চলে কিছু অর্থনৈতিক স্থায়িত্ব আছে, সেখানকার বিত্তবানদেরই এটা দাবী। শান্তিপূর্ণ আবহাওয়া ছাড়া ব্যবসা-বাণিজ্য সম্ভব নয়। সম্ভব নয় বিনিময়। (মদিনা অঞ্চলে মহম্মদের প্রথম সাফল্য লক্ষ্য করলে এটা বোঝা যাবে।) এর জন্য মানুষের মানসিক জগৎটাকেই পাল্টে দিতে হবে। 'সাম্য' বোধ, সৃষ্টি করতে হবে। কোন মানুষই ছোট বা বড় নয়। সকলেই সমান। কারণ, সকলেই তাঁর সৃষ্টি। বাস্তব জগতে যে অর্থনৈতিক বৈষম্য, সেটাও তিনিই তৈরি করেছেন', তবে মানুষ হিসাবে ধনীরা বড় নয়। কিশোর মহম্মদ সমস্যাগুলো ভাবেন আর উপায় খোঁজেন। ভেড়া চরিয়ে সারাদিন সময় কোথায়? চিন্তাগুলোকে সূত্রবদ্ধ করার জন্য অবকাশ চাই। এই হানাহানিতে যে ধ্বংস হয়, তাতে সবচেয়ে বেশি নিরাপত্তাহীন হয়ে পড়েন নিহত বা মৃত সমাজপতি বেনিয়াদের বিধবারা। তাদের সম্পত্তি তদারকি এবং ব্যবসা চালানোর জন্য, এবং ব্যক্তিগত নিরাপত্তার জন্য সৎ, বিশ্বাসী পুরুষের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। যুবক মহম্মদ এই রকম এক সম্পত্তিবান বিধবার অনুগ্রহ পান। তাঁর কর্মচারী থেকে সততা এবং নিষ্ঠার জোরে তিনি তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এবং পাণিগ্রহণ করেন। এখন তাঁর হাতে প্রচুর অবকাশ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'দুনিয়াদারী' (বাস্তব পরিবেশ) থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে পাহাড়ের নির্জন গুহায় বসে সমস্যার সমাধান খুঁজতে গেলেন তিনি। প্রকৃতি-পরিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কোন একটা বিষয়ে সমস্ত মন কেন্দ্রীভূত করলে যে-কোন আবেগ-প্রবণ মস্তিষ্কের একটা বিশেষ অবস্থা প্রাপ্ত হতে দেখা যায়। যেটাকে বলা হয়, 'প্যারাডক্সিকাল' স্তর। এই স্তরের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল সুপ্ত আকাঙ্ক্ষা, সুপ্ত দক্ষতার হঠাৎ চমক-লাগানো বহিঃপ্রকাশ। 'অলীক-শ্রবণ' এবং 'অলীক দর্শন' (হ্যালুসিনেশন) এই স্তরের লক্ষণ। সেই ব্যক্তি বা মহিলা শুনতে পান কেউ তাঁকে কিছু বলছেন, তাঁর সামনে কেউ একজন এসেছেন। তাঁর সঙ্গে তিনি কথা বলছেন। তাঁর নিজের মুখ থেকে বলা কথাগুলো তখন তিনি নিজে (যাঁরা তাঁকে দেখে এসেছেন) বিশ্বাস করতে পারেন না, এটা তাঁর কথা। অরবিন্দের শ্রীকৃষ্ণ দর্শন, রামপ্রসাদের কালীর সাহায্যে বেড়া বাঁধা, অমাবস্যার রাত্রে সূর্যোদয়.....ভর.....এগুলো কোনটাই ভণ্ডামি নয়। একটা মানসিক অবস্থান মাত্র। পরীক্ষা করে দেখা গেছে সন্তান-শোকে পাগল মাকে এই স্তরে পৌঁছাতে পারলে (সাজেশন পদ্ধতিতে পারা যায়), একটা পুতুলকেই তিনি তাঁর হারানো সন্তান ভেবে আদর করেন, বকেন, মারেন। এমন কি খেতে পর্যন্ত দেন।

মহম্মদেরও ঠিক এই অবস্থা হয়েছিলো বলে অনুমান করা যেতে পারে। তাঁর জিব্রাইল দর্শন অলীক দর্শনের নামান্তর মাত্র। বয়স্কা স্ত্রী এবং দু-একজন সমাজপতির সাহায্যে সেই অবস্থাটাকে সু-সংবদ্ধভাবে সূত্রবদ্ধ করা হয়। মানুষের মধ্যে মনুষ্য-নিরপেক্ষ একটা চালিকা শক্তির যে পরাবর্ত দীর্ঘদিন থেকে বিরাজ করছে, এঁরা সেটাকেই 'পারপাস রিফ্লেক্স' বা লক্ষ্য পরাবর্ত দিয়ে মানুষকে সংগঠিত করার কাজে লাগালেন। এখানেও শর্তহীন পরাবর্ত ভয়টাই প্রধান উপাদান। সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের মধ্যে হানাহানি এবং বাস্তব কিছু ওপর ওপর সমস্যার (তাৎক্ষণিক) সমাধান করা হলো। এলো একটা ধর্ম। যার মূল কাজ হল ঐহিক জীবনকে সংঘবদ্ধ করে সমাজটাকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচানো। তাই ইসলাম ধর্ম ব্যক্তি-মানুষের প্রতিটি খুঁটিনাটি ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেছে। জীবনটা বেঁধে দিয়েছে।

হানাহানির ফলে যে অসংখ্য বিধবা সৃষ্টি হয়, তাদের ভিক্ষুক হয়ে যাবার সম্ভাবনা থেকে নিরাপত্তা দেবার জন্য স্ত্রী-ধন এবং মেয়েদের সম্পত্তির অধিকারের কিয়দংশ দেবার দাবী ওঠে। আবার কন্যা-সন্তান যেহেতু নারী তাই নিকৃষ্ট, এই ধারণা থেকে সমান অংশ থেকে বঞ্চিতও করা হয়েছে। এমনইভাবে বিঘোষিত 'সবাই আল্লার সৃষ্টি' তত্ত্ব সমাজের সঙ্গে মেলাতে গিয়ে কৌশলের ক্ষেত্রে আপোস করতে হয়েছে। নীতি আর প্রয়োগ হয়ে গেছে বিপরীতধর্মী। এটা কোন মানুষ কিন্তু করেনি, করেছে খোদ ধর্মটাই। নারী নিয়ে যথেচ্ছাচার বন্ধের জন্য চার বিবাহতে নিজেদের সীমাবদ্ধ রাখার আইন তৈরি করতে হয়েছে। এর বেশী চলবে না। সন্তান জন্ম দিতে পারেন এমন কোন নারীকেই সেদিনকার আরব সমাজ ফেলে রাখার অবস্থায় ছিলো না। কারণ তাদের লোক-বলের প্রয়োজন ছিলো সেদিন। আত্মীয়-বিবাহকে উৎসাহিত করা হয়েছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আশ্চর্যজনকভাবে এই প্রশ্নে আর্য হিন্দুদের মনুও নিহত বা নিরুদ্দেশ ভাই-এর পত্নীর গর্ভে সন্তান উৎপাদনের বিধান দিয়েছেন। সন্তান সেই সময় কত প্রয়োজন ছিল মহম্মদের একটা বিধান থেকেই সেটা বোঝা যায়। তিনি নির্দেশ দিচ্ছেন, 'তলপেট প্রশস্ত এমন নারীকে বিবাহ করো'। মুসলমানদের কাছে বিবাহ কখনই 'ফরজ' কাজ নয়। যেমন নামাজ, রোজা ইত্যাদি। এটা সামাজিক কর্তব্য। তাই এর সঙ্গে যুক্ত থাকে সামাজিক দায়বদ্ধতা। কয়েকটি ক্ষেত্রে এরই জন্য বিবাহ নিষিদ্ধ করা হয়েছে:- 'ভরণ পোষণ করার ক্ষমতা না থাকলে বিবাহ হারাম (নিষিদ্ধ)।' বিবাহ থেকে মৃত্যু পর্যন্ত মানুষকে ধর্ম দিয়ে বেঁধে ফেলার চেষ্টা হয়েছে ইসলামে। সেই সময়কার আরব-সমাজকে রক্ষা করার জন্য এই রকম একটা প্রচণ্ড কেন্দ্রীভবনের (সেন্ট্রালাইজেশন) প্রয়োজনেই 'ইসলাম'-এর একেশ্বরবাদ বিকাশ লাভ করেছে। কেন্দ্রীভবন প্রক্রিয়ার সঙ্গে বল (বা ফোর্স) অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। আতঙ্ক সৃষ্টি এবং দমন ছাড়া মানুষকে রেজিমেন্টেড করা যায় না।

'হিন্দুত্ব' যেমন প্রচলিত ধর্মীয় ধর্মগুলোর সংজ্ঞানুসারে কোন 'ধর্ম'-ই হতে পারে না একটা রেস বা জন গোষ্ঠীর সংস্কৃতি, সেই দিক থেকে বলতে গেলে বলতে হবে 'ইসলাম' একটা 'জুরিসপ্রুডেন্স' (আইনের নীতি নির্ধারক মতবাদ)। খোদার আইনকে পৃথিবীতে কার্যকরী করার সংস্থা হিসাবে রাষ্ট্রের নীতি নির্ধারণ ইসলামের মতো এত সুগঠিতভাবে অন্য কোন ধর্মে নেই। রাষ্ট্রনীতিটাই নির্ধারিত হয়েছে ধর্ম দিয়ে। ম্যাকিয়াভেলির শক্তিশালী কেন্দ্রের ধারণা এবং রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ কর্তৃত্বের ধারণা ইসলাম থেকে এসেছে বলে অনেকে মনে করে থাকেন। এই কেন্দ্রীয় শক্তির ধারণা ফ্যাসিবাদের একটা স্বাভাবিক মতাদর্শ (ন্যাচারাল সোর্স)

AMARBOI.COM

ইসলামের শিক্ষা

এ-কথা ঠিক 'ইসলামে' মানুষে মানুষে বিভেদ করা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কিন্তু সেটা জন্ম-সূত্রে বিভেদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ (রক্ত, জাত বা দেশ)। কিন্তু সামাজিক এবং অর্থনৈতিক বিভাজনকে কেবলমাত্র স্বীকার করেই নেওয়া হয়নি, কখনও কখনও সেগুলোকে গ্রহণীয় করে তোলার জন্য অজস্র যুক্তি দেওয়া হয়েছে। কখনও দরিদ্রদের উপদেশ দেওয়া হয়েছে, 'সহ্য করো, যে সহ্য করে খোদা তাকে পছন্দ করেন।' (ইনল্লাহ মা আস সাবেরিন)। কখনও বা বলা হয়েছে: গরীবদের মরণোত্তর জগতে আরাম নিশ্চিত, অবশ্যই সে যদি ইমানদার বা বিশ্বাসী হয়। অতএব এই জগতে রাষ্ট্র এবং সমাজপতিদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা চরম অন্যায়।

সবচেয়ে বড় কথা, 'ইমানদার' এবং বেইমানদের ফারাক। অবিশ্বাসীদের প্রতি যেভাবে ছত্রে ছত্রে হুমকি এবং ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে কোরানে (এবং আগেই বলেছি মনুতে-ও) সেটা গোয়েরিং আইখম্যানদেরও হার মানিয়ে দেয়। এ-প্রসঙ্গে মুসলমানদের একটা সংগঠন থেকে প্রচারিত একটা পুস্তিকা থেকেই উদ্ধৃতি দেওয় যাক:- (১) 'আজ পর্যন্ত পৃথিবীকে সৎ পথে আনার জন্য খোদা অনেক নবী বা দূত পাঠিয়েছেন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

(নাজেল করেছেন।) তাদের মধ্যে মহম্মদ সব থেকে শ্রেষ্ঠ—শ্রেষ্ঠতম নবী।' যে কেউ প্রশ্ন করতে পারেন পৃথিবীটাকে সৃষ্টি করলো কে? মুসলমান বলবেন, 'আল্লাহ্', তাহলে তিনি 'অসৎ পৃথিবী সৃষ্টি করলেন কেন? আমার, আপনার যদি সৃষ্টি করার ক্ষমতা থাকে তো সবচেয়ে ভালোটাই তো করবো? ভালো করার ক্ষমতা থাকলে, খারাপ সৃষ্টি করবোই বা কেন, আবার তার জন্য এত ঝামেলা করে একে, ওকে বানাতে যাবোই বা কেন?' মুসলমান চুপ করে থাকে। তখন তাঁকে প্রশ্ন করা যেতে পারে, 'হয় আপনাকে মানতে হবে তাঁর কোন সৃষ্টি করার ক্ষমতা নেই। না হয় তিনি একজন খামখেয়ালি, দুঃখবাদী, প্রথমে খারাপ করে শাস্তি-টাস্তির ভয় দেখিয়ে অন্যদের দিয়ে ভালোটা করিয়ে নেন।' মুসলমান আপনাকে অমনি সঙ্গে সঙ্গে কাফের ফতোয়া দিয়ে দেয়।

(২) তাই কোরান [এবং হদিশের বিভিন্ন সময়ের বর্ণনায়] বলা হয়েছে:- আমাদের নবী পৃথিবীর পবিত্রতম ব্যক্তি। একমাত্র তাঁর পথই সঠিক পথ। বাকী সব ভুল এবং মিথ্যাতে ভরা [এরপর সব ধর্ম সমান বা তুমি তোমার ধর্মে থাকো আমাকে আমার ধর্মে থাকতে দাও—লাকুম দ্বীনে ওকুম ওয়ালে ইয়াদ্বীন!] 'মনু থেকে বিবেকানন্দ প্রত্যেকেই এই স্ব-বিরোধী কথাতে ভরা। আমারটা শ্রেষ্ঠতম, বলার পর তোমারটা যে অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট এটা বলতে হয় না। ঘৃণার বীজ, অবজ্ঞার মানসিকতা এখানেই তৈরি হয়ে যায়। প্রশ্ন উঠতে পারে এই স্ব-বিরোধিতা কেন? কারণ আগেই বলেছি, পরিস্থিতির চাপে বিশেষ করে স্ব-শ্রেণীর অক্ষোভকে প্রশমিত করার জন্য সুবিধাদান। শ্রেষ্ঠতম ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই সমাজ আবার দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়তে শুরু করে। 'শান্তি' এবং শৃঙ্খলা ভেঙে পড়ার মুখে এগুলো কিছু সংযোজন মাত্র। সেগুলো গুরুত্বপূর্ণ নয়।

(৩) কাফের (অবিশ্বাসী) কখনও ভালো হয় না। কাফের সত্য কথা বলে না। [মনুর নিম্নবর্ণ এবং নারীদের সম্পর্কে বলা কথাগুলো, কিম্বা হিটলারের ইহুদী এবং নারীদের সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি স্মরণ করুন].....ইত্যাদি ইত্যাদি [সূত্রঃ ইসলামি প্রকাশনী ট্রাস্ট, কলিকাতা]

ইসলামের রাষ্ট্রনীতি

ধর্ম হিসাবে ইসলামের সবচেয়ে বড় অবদান (শোষকদের হাতে) হল:- আধুনিক শক্তিশালী কেন্দ্র ভিত্তিক রাষ্ট্র গড়ে তোলা, এবং সমরনীতি। একটা সেন্ট্রাল কমান্ড (কেন্দ্রীয় নির্দেশ), সেই মতো নিজেকে উৎসর্গ করা। যেটা এক সর্বশক্তিমান, সর্বাধিনায়ক দ্বারা পরিচালিত, কর্তৃত্বে অংশীদারবিহীন আল্লাহ্‌র ধারণা থেকেই এসেছে। ধর্মের সেন্ট্রাল থিম বা মূল প্রতিপাদ্য বিষয়কে বাস্তবে প্রয়োগ করার এ-হেন নজির অতীতে দেখা যায় নি। ইসলামে রাষ্ট্র এবং ধর্মের সম্পর্ক সুস্পষ্টভাবে নির্দিষ্ট করা আছে। 'ধর্ম' হবে 'রাষ্ট্র' নীতি গ্রহণ করার (এবং ব্যাখ্যা) এবং গণসংযোগ গড়ে তোলার মাধ্যম। রাষ্ট্রের আনুকূল্যে তাই বড় বড় ধর্মীয় জমায়েতের এবং উপাসনার কেন্দ্র গড়ে তোলা

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয়। উপাসনাকে ব্যক্তিগত পর্যায়ে না রেখে জমায়েতে (জামাত) উন্নীত করা হয়। সেখান থেকেই একজন ইমাম বা পরিচালকের নেতৃত্বে জনগণকে সংগঠিত করা এবং মানতে শেখানোর কাজটা শুরু হয়ে যায়। একটা এলাকার জনগণের (মুসলমান) সঙ্গে দিনে অন্ততপক্ষে পাঁচবার এবং সপ্তাহে একট বড় জমায়েতের (জুম্মা) মাধ্যমে সংযোগ রক্ষা করা এবং তাদের একমুখী চিন্তায় শর্তাধীন করে তোলা হয়। এরকম একটা জনসমষ্টিকে প্রয়োজনে হিস্টিরিয়াগ্রস্ত করে তোলা অনেক সহজ। গণ-হিস্টিরিয়া।

যদিও ইমাম বা ধর্ম-জমায়েতের প্রধানকে স্বতন্ত্র এবং স্বাধীন ব্যক্তি বলে চিহ্নিত করা এবং ধর্ম-স্থান (মসজিদ, ট্রাস্ট ইত্যাদি) গুলো-কে স্ব-শাসিত সংস্থা বলে বলা হয়ে থাকে, আসলে এগুলোর নিয়োগ থেকে ভরণ পোষণ সমস্ত কিছুই রাষ্ট্রীয়। রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে এর ব্যয় নির্বাহ করার নির্দেশ আছে। সবচেয়ে বড় কথা, কোরানে রাষ্ট্রের লক্ষ্য সুস্পষ্টভাবে বেঁধে দেওয়া হয়েছে এই বলে:— 'শাসক হবেন খোদার নায়েব (গোমস্তা)। পৃথিবীতে খোদার শাসনে মদত দেওয়াই হবে তাঁর প্রধান কাজ।' ধর্ম এবং রাষ্ট্রনীতি এই রকমভাবে একাকার হয়ে একটা চরম দমনের যন্ত্র হিসাবে হাজির হবার সম্ভাবনা নিয়েই ইসলামী রাষ্ট্রনীতি আবির্ভূত হয়েছে।

তাই ইসলামী রাষ্ট্রনীতি কোন সময়েই আধুনিক গণতন্ত্র বলতে যা বোঝায় তার ধারে কাছেও ঘেঁষে না। কারণ দর্শনগতভাবে ইসলাম একমাত্র খোদাকেই আইন-প্রণেতা বলে মান্য করে। তা সে ইহ-জগতেরই হোক আর মরণোত্তর জগতেরই হোক। 'গণতন্ত্র'—যার কেতাবি ঘোষণা আইন প্রণয়নের কর্তা হচ্ছে জনগণ এবং জনগণ সেটা তাদের প্রতিনিধিদের মাধ্যমেই ধারণ করে থাকেন, এটা ইসলামী রাষ্ট্রনীতি মেনে নিতে পারে না। সমস্ত ধর্মের মতই, ইসলামেরও মৌলিক শিক্ষা সাধারণ মানুষ আলোক-বর্জিত তমসাচ্ছন্ন পাপী, তাই না, যুগে যুগে এত নবী, মহানবী সব পাঠাতে হয়! এই লোকগুলোকে আইন-প্রণয়নের দায়িত্ব দিলে দুনিয়াটা আর থাকবে? ছারখার হয়ে যাবে না?

আবার ইসলামী রাষ্ট্র (যার অন্যতম মৌলিক কাজ আইন প্রণয়ন করা) ব্যক্তি-একনায়কত্বও খারিজ করে। কারণ কোন ব্যক্তিরই আইন রচনার ক্ষমতা নেই। তাহলে ইসলামের রাষ্ট্র পরিচালন নীতি কি হবে? আগেই বলেছি, ইসলামী রাষ্ট্রের মূল লক্ষ্য খোদার শাসন কায়েম করা। খোদার শাসন মানে কোরানে যা লেখা আছে বা বিভিন্ন সময়ে যে সমস্ত তাৎক্ষণিক নির্দেশ হদিশে আছে সেই মোতাবেক রাষ্ট্র পরিচালনা করা। (আমাগো ব্যাদে হক্কলই আছে গিয়া—'আমাদের বেদে সবই আছে' মার্কা চিন্তার সঙ্গে কী অপূর্ব মিল) সুতরাং রাষ্ট্র পরিচালনার নীতি হবে 'ইলাহী হুকুমত' (বা খোদায়ী শাসন)। এক ধরনের থিওক্র্যাসি। তাই, খোদার আইন সম্পর্কে জানে-মানে একদল মানুষ মুসলমানদের ভোটে নির্বাচিত হয়ে একজন আমীরের নেতৃত্বে রাষ্ট্র পরিচালনা করবেন—এটাই হল আদর্শ ইসলামি রাষ্ট্র। এই নির্ধারিত সভাকে 'মজলিশ' বলা হয়। আমির সেটা ভেঙ্গে দিতে পারেন। (হিটলার থেকে ইয়েলেৎসিন ভায়া ইন্দিরা, জিয়া, স্মরণ করুন)। অন্য ধর্মাবলম্বী মানুষজন অবশ্যই ইসলামী রাষ্ট্রে বাস করতে পারবেন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তবে জিম্মি বা প্রজা হয়ে। নাগরিক হয়ে নয়। (বালথ্যাকারে-কে স্মরণ করুন, 'মুসলমানদের এই দেশে থাকতে হলে বিশেষ সুবিধা তো দূরের কথা, কোন রকম নাগরিক অধিকার ছাড়াই "প্রজা" হয়ে থাকতে হবে.....আ নেশন ইন মেকিং।' ইহুদীদের কোন শেকড় নেই তাই রাষ্ট্র বা নাগরিকত্ব দাবী তারা করতে পারে না..... 'হিটলার')।

রাষ্ট্রের লক্ষ্য এবং কাঠামো নির্ধারণ করার পর 'রেভিনিউ' এবং 'বন্টন' প্রশ্নেও কোরান এক অসাধারণ চমৎকারিত্ব দেখিয়েছে, কৌটিল্যের সঙ্গে যার সাদৃশ্য, আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের অবাক করে দেবার বস্তু।

চতুর্থ খলিফা কবি-যোদ্ধা আলির কবিতায় সেই বিখ্যাত পংক্তিটা স্মরণ করুন: 'স্বর্গের সব ফুল ফুটেছে পূবে (ভারতবর্ষে)।' মহম্মদ এবং তাঁর পরবর্তী খলিফারা জ্ঞানের জন্য, সম্পদের জন্য বার বার চীন এবং ভারতবর্ষে যাবার উপদেশ দিয়েছেন। ইসলামি রাষ্ট্রের কর-নীতি এবং বন্টন নীতিতে বেশ বোঝা যায়, এই তিনটে দেশের মধ্যে, ভাব এবং সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান যথেষ্ট জীবন্ত ছিলো। আধুনিক ইতিহাসও এই তত্ত্ব সমর্থন করে থাকে।

রাষ্ট্রীয় কোষাগারের প্রধান আয়ের ক্ষেত্রগুলো হলঃ (ক) উৎপাদিত ফসল বা পণ্যের অষ্টমাংশ (খ) পেশা কর (আজকের প্রফেশনাল ট্যাক্স এর সঙ্গে তুলনীয়) (গ) জাকাৎ কর (ঘ) 'জিম্মী'-দের থেকে সংগৃহীত কর।

এই সম্পদ সাধারণত সমাজের অনুৎপাদক সম্প্রদায়ের মধ্যেই বন্টন করা হয়। যেটা শ্রেণী বিভাজনের মূল শর্ত। একটা অংশ সমাজকল্যাণমূলক কাজেও ব্যয় করার নির্দেশ আছে। আধুনিক সমাজকল্যাণমূলক রাষ্ট্রের একটা ধারণা সেখান থেকে পাওয়া যায়। অনাথ শিশুদের ভরণ-পোষণ, বিধবা ভাতা, প্রতিবন্ধী ভরণ-পোষণ ইত্যাদি সবগুলো যে ইসলামি রাষ্ট্রের কাজের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে তার কারণ নিঃসন্দেহে যুদ্ধ-সংঘর্ষ-জনিত সামাজিক সমস্যা। যুদ্ধ মানেই সমাজে অনাথ শিশু, বিধবা নারী এবং বিকলাঙ্গের জন্ম। আশ্চর্যজনকভাবে দেখা যাচ্ছে, এই কল্যাণমূলক কাজগুলোকে ধর্মীয় কর্তব্য হিসাবে চিহ্নিত করার ফলে যত না মানবিক হয়েছে, তার চেয়ে অনেক বেশী সাম্প্রদায়িক (সম্প্রদায়ের কল্যাণের জন্য) এবং উদ্দেশ্যমূলক হয়ে গেছে। হিটলারের জাতীয় সমাজতন্ত্রী দলের কর্মসূচীর উদ্দেশ্যের সঙ্গে এক অদ্ভুত সাদৃশ্য আছে। নিঃশর্ত সেবা নয়, শর্তাধীন সেবা। 'ঐস্লামিক সমাজতন্ত্র শেষ বিচারে জাতীয় সমাজতন্ত্রে বিকৃত হয়ে অর্থনৈতিক বৈষম্যের স্থানে ধর্ম বা সম্প্রদায়গত বা জাতি-বৈষম্যকে আমদানী করে।' এর ফলে নিজের ধর্মের সম্প্রদায়ের বা জাতির বিত্তবানদের অবস্থানটা সুরক্ষিত হয়, যেটা শেষ বিচারে ফ্যাসিবাদের জন্ম দিতে বাধ্য।

তা'হলে দেখা যাচ্ছে, ইসলামের একেশ্বরবাদ আর্যদের সর্বেশ্বরবাদ বা মায়াবাদের মতই শ্রেণী-বিভাজনের ওপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছে। এবং সমাজের কর্তৃত্বের প্রশ্নে দ্বন্দ্ব এবং সংঘর্ষই এর কারণ। প্রচলিত সমস্ত কিছুর বিরোধিতা না করতে পারলে, নতুন বিত্তবানরা কর্তৃত্বে আসতে পারে না, নিজেদের অবস্থান সুরক্ষিত করতে পারে না, কারণ কর্তৃত্বে অধিষ্ঠিত অংশটা সমাজের সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলো নিয়েই নতুন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই অংশের অভ্যুত্থানটাকে ঠেকাতে চায়। তাদের নিজেদের বোঝা তারা জনগণের মধ্যে নামিয়ে আনে। জনগণকে নতুনভাবে শর্তাধীন করে তোলার প্রয়োজন দেখা যায়। আবার যেহেতু নতুন এই বিত্তবানরাও মূলত কর্তৃত্ববাদী এবং আত্ম-স্বার্থ সচেতন, তাই জনগণকে শর্তাধীন করে তোলার দর্শন হিসাবে তারা কোন 'সর্বাত্মক' পরিবর্তনকামী মতাদর্শকে সামনে আনতে ভয় পায়। কর্তৃত্বও (অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক) থাকবে আবার এগুলোর বিরোধিতাও করতে হবে এই রকম জটিল কাজ করতে পারে একমাত্র ধর্ম। ধর্ম এবং ধর্মগুরুদের জন্ম হয় তখনই। ইতিহাসে শোষকদের প্রয়োজনে ধর্মের জন্ম। মানব সভ্যতার বিকাশের ধারাতে ঐতিহাসিক আবর্জনা হিসাবেই এটা এসেছে। সমাজ-বিকাশের গতির বিরুদ্ধ-গতি এটা। সাধারণ ঝোঁক এবং বিরুদ্ধ গতির এই দ্বন্দ্বে যখন দ্বিতীয়টা সংহত হয়, সমাজ আবর্জনায় ভরে যায়। সাধারণ বিকাশধারা অনুধাবন করলে দেখা যাবে, শত্রুভাবাপন্ন, বিরুদ্ধ-প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রাম করে বড় হয়ে ওঠার সময় থেকে দীর্ঘদিন পর্যন্ত মানুষের কোন অতিপ্রাকৃত শক্তির প্রয়োজন হয়নি। প্রয়োজন হয়নি ধর্মের। মানুষ এবং সমাজ ইতিহাসের একটা পর্যায়ে এসে ভগবানের সৃষ্টি করেছে। ভগবান আদৌ মানুষের সৃষ্টি করেন নি। সেই ভগবানই যুগে যুগে কখনও হিটলার, কখনও মুসোলিনি, কখনও জার, কখনও তোজো হয়ে পৃথিবীতে এসেছে। একবিংশ শতাব্দীর দোরগোড়ায় দেশে দেশে চার্চ, মসজিদ, মন্দিরের হাত ধরে নয়া নাৎসিবাদ বাল্পাকারে, মওদুদির কণ্ঠে নিজেদের আগমনী বার্তা ঘোষণা করছে। সেটা আসছে সমাজতন্ত্রীদের বেইমানির রাস্তা ধরে। মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষার ধ্বংসস্তূপের ওপর সেই ইমারত গড়ে তোলার চেষ্টা করছে ক্লিন্টন, ইয়েলেৎসিনরা।

তাই বার বার বিশ্বধর্ম মহাসম্মেলনের উদ্যোগ দেখতে পাই। সেখান থেকেই মানুষকে 'এক কর্তৃত্বের ব্রহ্মাণ্ড এবং এক কর্তৃত্বের বিশ্ব তত্ত্ব' হাজির করা হয়। সব ধর্ম-নেতারাই এই কাজে আত্মনিয়োগ করেছেন। স্বার্থ তাদের একটাই। মুসলিম ধর্মনেতারা যখন ঢাকা ময়দানের জনসভা থেকে ঘোষণা করে, 'ভারতীয় মুসলমানদের শত্রু বি-জে-পি (হিন্দুবাদী রাজনৈতিক দল) নয়, তাদের আসল শত্রু কমিউনিস্টরা (১৬ই ডিসেম্বর ৯২), তখন বুঝতে অসুবিধা হয় না, বিরোধটা হিন্দুত্ব বনাম ইসলাম নয়। তাই মুসলিম মুখপাত্র বলতে পারে 'কমিউনিজমের জানাজা (শবযাত্রা) বেরিয়ে গেছে। ইসলামের বাণী দিয়ে সেই শূণ্যস্থান পূরণ করতে হবে।' সেই কথাটাই গোলওয়ালকার বলছে এই ভাবে, 'সমাজতন্ত্রের ধ্বংসের ফাঁকে হিন্দুত্বের জাগরণ দিয়ে ফাঁকটা ভরাট করতে হবে।'

তাহলে দেখা যাচ্ছে হিন্দুত্ব এবং ইসলাম, তাদের শত্রু এক এবং অভিন্ন। প্রভুও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একটাই। দুটো আপাত বিরোধী বস্তুর মধ্যে (মতবাদের) এই একটা সাধারণ গুণ থাকার জন্যই বস্তু দুটো পরস্পরের সঙ্গে সমান (a=c, b=c, অতএব a=b) হতে বাধ্য। হিন্দুত্ববাদীরা এবং ইসলাম এক জায়গায় মিলে গেছে। বালথ্যাকারে হয়ে গেছে ইমাম মেহেদি, পৃথিবী থেকে বিধর্মী বিতাড়নের দায় নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছেন। অন্যদিকে মওলানা, মৌলুভিরা বনে গেছেন কলির কৃষ্ণ, পৃথিবী থেকে কমিউনিস্ট বিতাড়নের জন্য ফতোয়া জারি করছেন, পেছনে থেকে ডিং ডিং ঘন্টা বাজিয়ে বুখারেস্ট চার্চ 'যীশু পরম দয়ালু!' স্লোগান তুলে ওয়ালেসা আর ইয়েলেৎসিনদের উৎসাহ জোগায়, যাতে তারা কামান দেগে মানুষকে উড়িয়ে দিয়ে দেখাতে পারে, বজ্রশক্তির অধিকারী ভগবান কত শক্তি ধরেন!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

মনু, মহম্মদ, হিটলার

আধুনিক যুগের মনু শ্রী গোলওয়ালকার 'আমাদের জাতি' শীর্ষক তাঁর লেখাতে বলেছেনঃ 'এক জাতি এবং সংস্কৃতির বিশুদ্ধতা রক্ষার জন্য হিটলার যখন সেমেটিক রক্তের জাতি ইহুদী নিধন এবং বিতাড়ন শুরু করেছিলেন, সমগ্র পৃথিবী হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু আসলে সেই সময়েই জার্মান জাতি তার গৌরবের সর্বোচ্চস্তরে পৌঁছে ছিল। জার্মান আমাদের শিক্ষা দিয়েছে দুটো পরস্পর বিরোধী রক্ত-জাত জাতি এবং বিরোধী সংস্কৃতির পার্থক্যটা মৌলিক ..... তাদের কোন সময়েই একীভূত হওয়া সম্ভব নয়। হিন্দুস্থানে আমাদের এই ঘটনা থেকে শিক্ষা নিতে হবে। সেই কর্ম-কৌশল আয়ত্ত করতে হবে।'

গোলওয়ালকারের সাঙাত আধুনিক আইখম্যান 'বর্গী' সম্প্রদায় ভুক্ত (সেই দস্যু বর্গীদের কথা স্মরণ করুন। বাঙলার গ্রামে গ্রামে হানা দিয়ে যারা লুটতরাজ করে দেশে ফিরে যেত, যাদের আতঙ্ক বংশ-পরম্পরায় বাঙালি ভুলতে পারে না। আজও বাঙলার মায়েরা দুষ্টু ছেলেমেয়েকে রাক্ষস-খোক্কস ভূতের সঙ্গে বর্গীদের ভয় দেখিয়ে শান্ত করেন। 'ছেলে ঘুমুলো, পাড়া জুড়োলো/বর্গী এলো দেশে") বালথ্যাকারে বলছেন, 'হিটলার আমাদের যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ দেশপ্রেমিক।'

হিটলার স্বয়ং

মহাপণ্ডিত (মতান্তরে মূর্খ) গোলওয়ালকার মনুষ্য-রক্তের বিভিন্নতা আমদানি করে তাঁর পাণ্ডিত্য জাহির করার চেষ্টা করেছেন। এটা তিনি পেয়েছেন আর্য শিক্ষা থেকে। হিটলারের 'রক্ততত্ত্ব' তাঁকে চমৎকৃত করে দিয়েছে। কারণ হিটলার ক্ষমতায় আসার পর জার্মান দেশে রক্তের বিশুদ্ধতা রক্ষার আইন জারি হয়। আহত জার্মান সৈনিক বা নাগরিককে যেন ইহুদী রক্ত না দেওয়া হয় এই ব্যাপারে হিটলারের কড়া নির্দেশ ছিল। (রাসেলের মন্তব্য এবং প্রবন্ধ স্মরণ করুন)। আধুনিক মনু, বিশুদ্ধ হিন্দু গোলওয়ালকারের মতে জার্মান জাতির উন্নতির এটা একটা কারণ। গোলওয়ালকার নিশ্চয়ই ক্ষমতা হাতে পেলে 'হিন্দু রক্তের ব্লাড ব্যাঙ্ক' প্রতিষ্ঠা করবে, সেগুলোর মধ্যে আবার নিম্নবর্ণ জাত হিন্দুর ব্লাড ব্যাঙ্ক, মুসলমান ব্লাড ব্যাঙ্ক সব পৃথক করে দেবার নির্দেশ দেবেন। না হলে ভারতীয় জাতি মানে হিন্দুদের উন্নতিটা রক্তেই আটকে যাবে। গোলওয়ালকার যেটাকে জার্মানের জাতীয় উন্নতির স্বর্ণযুগ বলছেন, সেটা আসলে কি? দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, শিল্পীর জাত—জার্মানকে হিটলার তার রক্তের বিশুদ্ধতা দিয়ে একটা যুদ্ধবাজ, রক্ত-পিপাসু, উন্মাদের জাতিতে পরিণত করেছিল। সেই জাতীয় লাঞ্ছনা আজও জার্মানকে বয়ে চলতে হচ্ছে।

যাই হোক, বালথ্যাকারের ভাষায় সঠিক, খাঁটি, আর্য এবং শ্রেষ্ঠতম "হিন্দু" সেই হিটলার নিজে কী বলছে দেখা যাক:-

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"ইহুদীরা একটা শেকড়-বিহীন জাতি ..... মার্ক্সবাদীরা সকলকেই উদ্ধার করতে চায় কিন্তু ইহুদীদের উদ্ধার করা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। কারণ তারা যোগ্য নয় (স্মরণ করুন, শূদ্রদের সম্পর্কে এবং নারীদের প্রসঙ্গে আসল মনুর উপদেশ), মার্ক্সবাদ ইহুদীদের মতবাদ, তারা প্রকৃতির অভিজাত্যতত্ত্ব অস্বীকার করে এবং তারা 'শক্তি'র কথা বলে। সংখ্যাধিক্য-কে বিশ্বাস ক'রে (জনগণ নামক) একটা মৃতের বোঝা আমাদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে চায়। তারা জাতিত্বকে ব্যক্তির ওপরে এবং প্রজাতিকে জাতির ওপর স্থান দেয়.....

এটাই যদি মানুষ গ্রহণ করে তাহলে সার্বিক বিশৃঙ্খলা দেখা দেবে। ইহুদীরা যদি মার্ক্সবাদীদের সাহায্যে ক্ষমতায় আসে সেটা হবে মানব জাতির চরম সর্বনাশ! ইতিহাসের এক বিশাল পর্বের ইহুদী কার্যকলাপ সম্বন্ধে আমি গভীর অনুসন্ধান এবং অনুশীলন করে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিলাম।

তাই আমি মনে করছি, আজ আমি যা করছি (ইহুদী নিধন) সেটা সর্বশক্তিমান স্রষ্টার ইচ্ছানুসারেই করছি। ইহুদীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে আমি ভগবানের সৃষ্টিকেই রক্ষা করছি। (রাইখের) পাঁচশ' লোকের মতামত নিয়ে দেশ চালাতে গিয়ে সরকার নিজেকে ইতরের স্তরে নামিয়ে এনেছে। (হিটলারের আত্মজীবনীর বিভিন্ন অংশ)।

[মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন! গোলওয়ালকারের 'পূজ্যবীর' এই লোকটা! শেষের মতামতটা কী অদ্ভুতভাবে ইসলামী রাষ্ট্রনীতির সঙ্গে মিলে গেছে। মনে হচ্ছে যেন সেখান থেকেই উদ্ধৃতি নিচ্ছে হিটলার! এই সাদৃশ্য মোটেই কাকতালীয় নয়।

হিটলার ইহুদীদের কার্যকলাপ (বিত্তহীনদের এবং বঞ্চিতদের বঞ্চনার বিরুদ্ধে যাঁরা মানবজাতিকে সচেতন করতে চেয়েছেন, সেই সমস্ত চিন্তাবিদরা যেহেতু জন্মসূত্রে ইহুদী ছিলেন) দেখে উদ্বিগ্ন হয়ে তার স্বস্তিকা চিহ্নধারী (হিন্দুত্ব থেকে নেওয়া) ঝটিকা বাহিনী তৈরি করে ইহুদী নিধনের কাজে লেগে পড়ে।

এই রকমভাবে দক্ষিণ ভারতের 'মপলা' কৃষকদের অভ্যুত্থান (যারা ধর্ম মতে মুসলমান) দেখেই হেড়গেওয়ার তৈরি করেন হিন্দুদের ঝটিকা বাহিনী 'আর এস এস (বা রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘ)।' আর-এস-এস-এর জন্ম সম্পর্কে তাদের প্রচারিত পুস্তকে বলা হয়েছে '২১ সালের পর থেকে ডাক্তারজি (হেড়গেওয়ার) মুসলমানদের সম্পর্কে অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে ওঠেন। মুসলমানদের বাড়াবাড়ি এবং বেইমানি বিশেষ করে মপলাদের মধ্যেই এই সব দেখে তিনি সিদ্ধান্ত নেন একমাত্র হিন্দুত্বই হিন্দুস্থানকে মুক্ত করতে পারে।' এই প্রসঙ্গে একটু ভারতবর্ষের ব্রিটিশ বিরোধী মুক্তিসংগ্রামের প্রথম পর্যায়টাকে স্মরণ করা যেতে পারে। প্রথম অসহযোগ সত্যাগ্রহের বিরোধিতা আসে কংগ্রেসের মধ্যকার হিন্দু নেতাদের মধ্য থেকে। এই আন্দোলনে নির্যাতিত এবং গ্রেফতার হওয়া মানুষের মধ্যে শতকরা ষাটজনই ছিলেন মুসলমান সম্প্রদায়ভুক্ত। বিশেষ করে দক্ষিণের কৃষকদের সামন্ত বিরোধী সংগ্রাম, ব্রিটিশকে চিন্তায় ফেলে দেয়। সামন্তদের স্বার্থ রক্ষার জন্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তি এগিয়ে আসে। (রমা রঁলার কাছে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের প্রেরিত রিপোর্ট থেকে। রঁলার ডায়েরি)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই পরিস্থিতিতেই দক্ষিণের সামন্তদের রক্ষার জন্যই ব্রিটিশের সাহায্যে গড়ে ওঠে আর-এস-এস। 'হিন্দুত্ববাদীদের এই দেশদ্রোহী-জন্মসূত্র ব্যাখ্যা করে ঐতিহাসিক বিপান চন্দ্র প্রশ্ন তুলেছেন:- তাদের কাছে জাতীয় হিরো কে? শিবাজী, রানা প্রতাপ, গুরু গোবিন্দ ইত্যাদি ব্যক্তি। আকবর, গুরু নানক, জাতীয় হিরো নন, মঙ্গল পাণ্ডে, কুঁয়ার সিং, তাঁতিয়া টোপী, বেগম হজরতমহল, টিপু, সূর্যসেন এঁরা কেউ-ই জাতীয় হিরো বা নায়ক নন। অর্থাৎ তাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে যাঁরা মুসলমান রাজা-বাদশাদের সঙ্গে লড়াই করেছেন তাঁরাই জাতীয় নায়ক। (ভুলেও) ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রামের একজনকেও তাঁরা জাতীয় নায়ক তৈরি করেন নি। এই রকমভাবে বৃটিশদের সরবরাহ করা উপাদান দিয়ে ইতিহাস লিখতে গিয়ে ইতিহাসেই সাম্প্রদায়িকতার ভেজাল ঘটে গেছে।

ইতিহাস এবং মতাদর্শে ভেজাল হচ্ছে ফ্যাসিবাদের তাত্ত্বিক বনিয়াদ। আর-এস-এস-এর জন্ম ও হিটলারের 'ঝটিকা বাহিনীর' অভ্যুত্থান একই সময়ে এবং একই 'স্বস্তিকা' থেকে। এরকম একটা অনুমান (সত্যও বটে) খাড়া করা যেতেই পারে একই শক্তির প্রয়োজনে আন্তর্জাতিক একটা কেন্দ্র হিসাবেই এটা গড়ে উঠেছিল। এর সঙ্গে মিলিয়ে পড়তে হবে মুসোলিনির আন্তর্জাতিক সমর্থনের আশ্বাস—যেটা সে তার কর্মীদের বারবার দিয়ে এসেছে।

একই রকমভাবে হিন্দুত্ববাদী নেতা গোলওয়ালকার বলছেন:- দুনিয়ার এই সমস্ত চালাক জাতিগুলোর (ইতালি এবং জার্মান) কাছ থেকে আমাদের শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। এবং আমাদের এই সিদ্ধান্ত অনুধাবন করতে হবে যে, ভারতবর্ষে যে সমস্ত অহিন্দু (অ-হিন্দুর সংজ্ঞা কিন্তু পরিষ্কার করা নেই। পুরীর শঙ্করাচার্য তো তথাকথিত নীচু জাতের লোকদের হিন্দু বলতেই নারাজ।) মানুষ থাকবে তাদের অবশ্যই হিন্দু কৃষ্টি এবং ভাষা গ্রহণ করতে হবে। অবশ্যই হিন্দুধর্মকে শ্রদ্ধা করতে শিখতে হবে। হিন্দু জাতি (! লক্ষ্য করুন)-র আদর্শ মহিমান্বিত করা ছাড়া অন্য কোন ধারণাকে তাদের মানা চলবে না। এখানে থাকতে হলে তাদের কোন কিছু দাবী-দাওয়া ছাড়াই থাকতে হবে। বিশেষ সুবিধার তো প্রশ্নই ওঠে না।'

এমন কি কোন রকম নাগরিকত্বের অধিকার ছাড়াই হিন্দুদের অধীনে থাকতে হবে। 'জিম্মী'-দের সম্পর্কে ইসলামি রাষ্ট্র ঠিক এতটা না হলেও একই কথা বলেছে। হিটলারের কথা এ-প্রসঙ্গে না তোলাই ভালো। কারণ উভয় পক্ষেই তাদের আদর্শ হিসাবে হিটলারকে ধরেই এগিয়ে চলেছেন। আবার গোলওয়ালকার বলছেন, 'তাদের (অ-হিন্দুদের) বিদেশি হওয়া চলবে না। কমিউনিস্টরা অ-হিন্দু কারণ তারা বিদেশি।' বিচিত্র ব্যাপার। হিটলার কিন্তু বিদেশি নয়, বিদেশি হল শুধু মার্ক্স। "পশ্চিমী গণতন্ত্র এবং জাতির ধারণা আমাদের ত্যাগ করতে হবে।" (এক্ষেত্রেও হিটলারকে পশ্চিমী হওয়া থেকে ছাড় দেওয়া হয়েছে)।

ইসলাম-পন্থীরা

এবার দেখা যাক ইসলামের পাহারাদার, ভারতবর্ষে 'নবী'র জীবন্ত প্রতিনিধি জামায়েত

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইসলামের আমির মওলানা মওদুদি সাহেব কী বলছেন: 'আপনারা কি জানেন কেন তারা (হিটলার, মুসোলিনি) সফল হয়েছিলেন? দু-টো দেশেই, দু'টো ক্ষেত্রেই একই ধরনের দুটো কারণ আছে (এক) বিশ্বাস। (দুই) আমির বা নেতাকে বিনা শর্তে মানা এবং তার কথাকেই চরম আদেশ বলে গ্রহণ করা। যে সমস্ত দল একটা শক্তিশালী আদর্শ এবং চমৎকার সাম্প্রদায়িক দর্শনের ভিত্তিতে গড়ে ওঠে, সব সময়েই তাদের সদস্য সংখ্যা অল্প থাকে।

'মুসোলিনি'র পার্টির সদস্য সংখ্যা ছিল মাত্র চার লাখ। রোমের সড়ক ধরে তারা যখন অভিযান শুরু করে, তারা ছিল মাত্র তিন লাখ। এই তিন লাখ লোকই মাত্র কয়েক মাসেই সাড়ে চার কোটি লোককে পদানত করে ফেলেন (তরেজুমান-উল-কোরান পত্রিকা, আগস্ট '৭৫)।'

তা'হলে পদানত করে ফেলার কৌশল এবং নীতি খুঁজতে গোলওয়ালকার, বালথ্যাকারে এবং মওদুদি সাহেব একই জায়গায় ঢুঁ মারছেন। গোলওয়ালকারের যুক্তি নয় 'বিশ্বাস', হিটলারের 'ফেইড্ইজ্ম', মওদুদির 'প্রশ্নাতীত' ভাবে মানা এগুলো যে নিছক ধর্ম বা পরলোক চিন্তা নয়, সেটা তো পরিষ্কার। সকলেই চান এই দুনিয়ার কর্তৃত্বটা। না হলে পরলোকে তিনি শান্তি পাচ্ছেন না। প্রত্যেকেই মনে করেন, তিনিই তাঁর খাস প্রতিনিধি। ইসলামের এই উচ্চাকাঙ্ক্ষী হবু শাসকরা হিন্দুদের বিমূর্ত বিশ্বাসবাদকে (বাবরি ধ্বংসখ্যাত কল্যাণ-আদবানির উক্তি স্মরণ করুন: ধর্ম-জনমভূমির প্রশ্নটা যুক্তির নয়, 'বিসওয়াস্ কা সওয়াল'—বিশ্বাসের প্রশ্ন) কেমনভাবে তুলে ধরছেন দেখুন: ..... 'আমাদের নবীই দুনিয়ার সেরা মানুষ (অর্থাৎ সেই মানুষের সেরা সেবক আমি। সুতরাং আমিই দুনিয়ার সেরা মানুষ—লেখক)। তার পথই শ্রেষ্ঠ পথ (অর্থাৎ আমার পথ।) এটা বিশ্বাস করতে হবে। মহম্মদকে না মানলে যেমন খোদাকে মানা যায় না সেই রকম "আমাকে" না মানলে মহম্মদকেও মানা যায় না। প্রশ্নাতীত ভাবে এটা মেনে চলতে হবে কারণ আমিই আমির। আবার 'আমির' তৈরি হয় কী করে? এখানেও হিটলারের 'প্রাকৃতিক আভিজাত্যের তত্ত্বটা' এসে হাজির হয়েছে। 'যে শাসনতন্ত্রে জনগণের নিরঙ্কুশ স্বাধীনতার কথা স্বীকৃত, ইসলামি রাষ্ট্রনীতিতে তার কোন স্থান নেই। কারণ এটা আল্লাহ্‌র ইচ্ছানুযায়ী। তাহলে তো আল্লাহ্-ই পাঁচটা আঙুল সমান করে সৃষ্টি করতেন!' এই পাঁচ আঙুলের তত্ত্ব মনু, মহম্মদ, নীৎসে থেকে সাধ্বী ঋতম্ভরা, মওলানা মওদুদি প্রত্যেকেই বিশ্বাস করেন। কমিউনিস্টরা এই তত্ত্ব স্বীকার করে না বলেই, সকলেরই সমান শত্রু— 'কমন এনিমি।' মওদুদির বলিষ্ঠ ঘোষণা, 'মার্ক্সবাদের কবরের ওপরেই ইসলাম বিকশিত হবে' অর্থাৎ কমিউনিস্টদের হাড় আর রক্তই ইসলামি পুষ্পের সার বা খাদ্য। এই আমির তৈরি হয় কী ভাবে? বিশ্বাসী মুসলমানদের ভোটে নির্বাচিত। এই 'বিশ্বাসী মুসলমান' বস্তুটা কি? ব্যাখ্যা না থাকলেও বোঝা যায়: আসরাফ মুসলমান, যাদের টাকা এবং আভিজাত্য আছে। সেই আমির 'মজলিশ সুরা' গঠন করে পরামর্শের জন্য। এর মানে কখনই সংখ্যাধিক্যের মত মেনে নেওয়া বোঝায় না কারণ 'পাঁক তো তাল তাল পাওয়া যায় ফুল একটা আধটা (মানে সত্য)';

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তা হলে দেখা যায়: হিটলারের 'ইতর, মৃতের বোঝা', মনুর 'শূদ্র এবং নারী', ইসলামের 'পাঁক'-সেই সাধারণ মানুষকে ঘৃণা করাটাই তিনজনের জীবনবোধ!

সার সংক্ষেপে

তাহলে মোদ্দা ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে: 'ধর্মীয় নেতারা আসলে এই দুনিয়াটার কর্তৃত্ব-ই চায়। এই ব্যাপারে তাদের রণনীতি রণকৌশলটা একই। সেগুলো: (১) তিন দলই সাধারণ মানুষকে ভয় করে, ভয় থেকে আসে ঘৃণা। হিটলারের কাছে তারা শুধু খায়, মৃতের বোঝা। গোলওয়ালকারের কাছে 'শূদ্র', কঠোর পরিশ্রমের জন্য নিয়তি নির্ধারিত জীব, কোন সময়েই স্বাধীনতা চাওয়ার যোগ্য নয়। মুসলমান নেতারা তাদের মনে করে 'পাঁক'। যদিও মুসলমান নেতাদের রীতি অনুসারে হিটলারের মতবাদ গ্রহণযোগ্য হওয়া উচিত নয় (কারণ তাদের খোদায়ী শাসন-এর মূল কথা হল আইন জারি করতে পারে একমাত্র আল্লাহ্ তাঁর নবীদের মারফৎ এবং সেটা কার্যকারী করবে আমির, কোন ব্যক্তির সেই ক্ষমতা থাকা উচিত নয়,) তবুও তারা ক্ষমতা দখলের জন্য হিটলার, মুসোলিনির পথকেই পছন্দ করে। এই প্রশ্নে, হিন্দুত্ববাদীদের সঙ্গে তাদের ঐক্য স্পষ্ট। (২) তিন দলই (হিন্দু, মুসলমান এবং ফ্যাসিস্ত) চায় সমাজে মুষ্টিমেয় অভিজাতদের হাতে কেন্দ্রীভূত ক্ষমতা। এক্ষেত্রে সামান্যতম বিচ্যুতি তাদের কাছে অসহ্য। (৩) এরা প্রত্যেকেই প্রথমেই মানুষের সাধারণ দুর্বলতাগুলোকে কাজে লাগানোর জন্য তাদের মধ্যে প্রচলিত বিশ্বাস, মতবাদ এবং সংস্কৃতির ওপর হামলা চালানোর কর্মকৌশলে বিশ্বাসী। হিটলারের কাছে, অপেক্ষাকৃত উন্নত ইহুদী এবং সেমেটিক সংস্কৃতি অপকৃষ্ট। তাই সে গান-কবিতা নাটককে নির্মমভাবে আঘাত করতে পিছপা হয়নি। 'কুলটুর' বা কালচারকে সে ঘৃণ্য বিষয় হিসাবে চিহ্নিত করেছে অজস্র জায়গায়। কোরানে তো, উদ্‌ভ্রান্ত কবিদের মানসিক অস্থৈর্যের বিষয় উল্লেখ করে রীতিমত ভয় দেখানো হয়েছে। গোলওয়ালকারও মনে করেন, সংস্কৃতি একটা ক্ষতিকারক বস্তু। তাই এদের প্রথম হামলাটার টার্গেট হয় প্রচলিত সাধারণ সংস্কৃতি। তাই তাদের 'মোডাস অপারেন্ডি' হল সাংস্কৃতিক সন্ত্রাস সৃষ্টি করা। অর্থাৎ এক কথায় সাংস্কৃতিক সন্ত্রাসবাদের আর এক নাম ফ্যাসিবাদ, হিন্দুবাদ কিম্বা ইসলামীবাদ। (৪) এই কারণেই তারা বিরোধী সংস্কৃতির প্রচার সম্পর্কে আতংকিত, এবং যে-কোন মূল্যে তার প্রচার এবং প্রসার রুখতে বদ্ধপরিকর। (৫) এই কারণেই তারা বিরোধী সংস্কৃতির জনগোষ্ঠী সম্পর্কে অসহিষ্ণু, কারণ মানসিক জগৎ থেকে চ্যালেঞ্জকে তারা ভয় পায়। তারা এ-ক্ষেত্রে উচ্ছেদে বিশ্বাসী। কারণ তাহলে নিজেদের সর্বময় কর্তৃত্বের বৈধতা-টা স্বীকার করিয়ে নেওয়া সহজ হবে। (৬) তিন দলই শেষ বিচারে কমিউনিস্টদের তাদের চরম শত্রু হিসাবে চিহ্নিত করে থাকে। হিটলার মনে করতো মার্ক্সবাদ ইহুদী মতবাদ। হিন্দু নেতারা মনে করে কমিউনিস্টরা বিদেশি। মুসলমানরা মনে করে সেটা 'কাফেরের দর্শন', শয়তান তৈরির কারখানা। (ইকবাল)।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বৃত্তটা সম্পূর্ণ করার জন্য: অভিজ্ঞতার সার সংকলন

তিনটে মতবাদ, রণনীতি এবং রণকৌশল এমন যে অদ্ভুতভাবে মিলে গেছে সেটা কি আকস্মিক? নাকি তিন দলই এক স্বার্থের প্রতিনিধি? গোলওয়ালকার এবং বালথ্যাকারে কিম্বা মওদুদির একই ভাষায় একদিকে হিটলারের প্রশস্তি অন্যদিকে বিদেশী বিরোধিতা, এর কারণ কি? হিটলার জন্মশতবর্ষে মার্কিন প্রেসিডেন্টের নিঃশর্ত শ্রদ্ধা জানানোর পরই এই সমস্ত ধর্মীয় নেতাদের হিটলার পূজো শুরু হয়।

এতক্ষণ আলোচনা থেকে এটা পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠেছে 'ফ্যাসিবাদ' কথাটা কেবলমাত্র একটা বিশেষ আর্থ-সামাজিক পর্যায়ের রাজনৈতিক সংগঠন নয়। এটা ব্যক্তির ক্ষেত্রে একটা মানসিক অবস্থান, এবং সমাজের ক্ষেত্রে একটা সংস্কৃতিও বটে। যার উৎসটা রয়ে গেছে ধর্ম এবং প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মমতগুলোর মধ্যে। আর এটা চলছে হাজার হাজার বৎসর ধরে। এটা একটা হামলাবাদী সংস্কৃতি। অথবা বলা যায় ফ্যাসিবাদ, অন্য অর্থে সাংস্কৃতিক সন্ত্রাসবাদ।

মানুষের মধ্যে একাংশ যখন পরের পরিশ্রমে বাঁচার উপায় আবিষ্কার করলো, অন্যদিকে ব্যাপক মেহনতী মানুষ নিজের শ্রমের ফল থেকে সম্পূর্ণ বিযুক্ত হয়ে সেটা অন্যের হাতে তুলে দিতে বাধ্য হল, যখন 'শ্রম'-টা তাদের লক্ষ্য না হয়ে 'উপার্জনের' উপায় মাত্র হয়ে দাঁড়ায় অর্থাৎ যে-শ্রম মানুষকে মানুষ করেছিল, মানুষের জীবনের আর এক নাম ছিল যে-শ্রম, সেটাই হয়ে দাঁড়ায় জীবন-ধারণের বস্তু। এক কথায়, জীবনই হয়ে দাঁড়াল জীবন-ধারণের কষ্টকর পথ, লক্ষ্যটা হল উপায়—সেই যুগে মানুষ শ্রমের ফল থেকে বিচ্ছিন্ন হবার সঙ্গে সঙ্গেই শেকড়-বিহীন হয়ে পড়ে। স্বাভাবিকভাবেই এই রকম মানুষ শুরু করে উৎসের সন্ধান।

মানুষের অবস্থান হল উৎসের সন্ধানে ভেসে বেড়ানো একদল কচুরি-পানার মত। অন্যদিকে পরশ্রমজীবী অংশটাও সমাজ ও জীবন থেকে বিযুক্ত হয়ে পড়ে। সমষ্টির স্থানে আসে ব্যক্তি। এরা সমাজে নিজেদের যথার্থতা খোঁজার জন্য, গ্রহণযোগ্যতা বাড়িয়ে তোলার জন্য প্রাকৃতিক ঘটনাবলী থেকে যুক্তি খুঁজতে শুরু করে। অথচ প্রাকৃতিক ঘটনাবলী ব্যাখ্যা করার মত যথেষ্ট তথ্য তখন তার ছিল না। নিজেদের অবস্থানটা সঠিক এবং অনড়-অটল (কর্তৃত্ব এবং প্রভুত্বকারী) এটা ধরে নিয়েই সে প্রকৃতির সামনে হাজির হয়। মেলাতে না পেরে (মাইন্ড অ্যাণ্ড ম্যাটারে) একটা অতিপ্রাকৃতিক বস্তুর আবিষ্কার করে, তার ওপর অমরত্ব (নিজের আকাঙ্ক্ষা), বিরাটত্ব এবং সর্ব-শক্তিময় রূপটা চাপিয়ে দেয়। এবং সেখানটাতেই নিজের উৎস খুঁজতে শুরু করে। জমির আবার ফলবতী হবার ঘটনা দেখে, তার নিজের সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে যাবার আশংকা দূর হয়। প্রকৃতি হয়ে যায় 'নারী'। 'নারী' হয়ে যায় 'প্রকৃতি', মানবীও ফলবতী হবে। বীজের মাটিতে লীন হয়ে যাওয়া এবং নির্দিষ্ট সময়ের পরে আবার গাছের মাধ্যমে বহুগুণে বর্ধিতাকারে পুনরুৎপাদিত হওয়া, এই দুটো দেখে মৃত্যুর পর পুনরুত্থান (বা পুনর্জন্মের) বিশ্বাসে বিশ্বাসী হয়ে ওঠে (আমি অমর.....আবার আসব)।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'মৃত্যু' সহনীয় হয়ে ওঠে। সান্ত্বনা নামক বস্তুটার জন্ম হয়। পরজন্মের জন্য এই জন্মটাকে বলি দেবার বা মেনে নেবার মানসিকতা জন্ম নেয়।

এই দুটো বস্তুই (ভয় এবং সান্ত্বনা) পরশ্রমজীবী বিচ্ছিন্ন সম্প্রদায়টা নিজেদের সামাজিক অবস্থানের যথার্থতা প্রমাণ করার জন্য এবং সুরক্ষার জন্য হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করে। সামাজিক সংগঠনেও এর একটা প্রভাব পড়ে। সমস্ত মানুষের স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা সংগঠনের জায়গা নেয় 'ভীত সন্ত্রস্ত করে অধীনতা স্বীকারে বাধ্য করার সংগঠন'—রাষ্ট্র। পীড়নের যন্ত্র। প্রকৃতি- নির্ভর আদিম সরল বিশ্বাসের জায়গা নেয় ধর্ম।

অন্যের জন্য শ্রম করার মত একদল মানুষের সৃষ্টি নিশ্চিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই দেখা দিলো শ্রম বিভাজন। এই শ্রম বিভাজন সামাজিক উৎপাদনকে অনেক গুণ বাড়িয়ে দেয়। সমাজকে খণ্ড খণ্ড করে দেয়। মূলত সমাজ উৎপাদক এবং ভোক্তা সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়ে পড়ে। উৎপাদনকারীকে তার শ্রমশক্তিজাত উৎপাদিত বস্তু থেকে বঞ্চিত করেই বাড়তে থাকে 'ঐশ্বর্য'। বঞ্চিতরা অর্থাৎ এই উৎপাদকরা সমাজের অংশীদার না হয়ে, হয়ে যায় দাস। দুঃখদুর্দশা-ক্লিষ্ট ভারবাহী এক ধরনের জীব। যারা সমাজ পরিচালনা থেকে সম্পূর্ণ নির্বাসিত। এই বিচ্ছিন্নতা বোধ থেকে যে এক ধরনের অসহায়তা-বোধের জন্ম হয় সেটা থেকে যাতে অনাগামিতার জন্ম না হয় তার জন্য ব্যাখ্যার ঝাঁপিটা নিয়ে আসে নানান দর্শন। তারা শুধু ব্যাখ্যাই করে যান।

অসহায়, দুর্দশা-ক্লিষ্ট, লাঞ্ছিত মানুষ, বাস্তব দুনিয়ার একটা রূপকল্পের মধ্যে নিজের লাঞ্ছনাহীন জীবনের সন্ধান খোঁজে। সেখানেই সে খোঁজে শান্তি, স্বস্তি (যেগুলোর ধারা তার রক্তে আছে, যেগুলো তার কাছ থেকে বহুদিন আগে কেউ কেড়ে নিয়েছে। এই রাষ্ট্র, এই সমাজ এবং মানুষের এই দুনিয়াকে বাদ দিয়ে তো আর 'মানব' হতে পারে না। এগুলো সব মিলিয়েই মানুষ। তাই মানুষ মানে মানুষের এই দুনিয়াটা। এই দুনিয়া এবং সমাজই ধর্মের সৃষ্টি করেছে..... ধর্ম হল, বাস্তব এই দুনিয়ার বিপরীত প্রতিকল্প। ধর্ম মানে, সেই বিপরীত প্রতিকল্পের তত্ত্ব।

এমনভাবে একটা নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক পর্যায়ে শ্রেণীর উদ্ভবের সঙ্গে সঙ্গেই বঞ্চিতের হাহাকার, নীরব প্রতিবাদ আর মৃত্যুর পর বঞ্চনাহীন চিরসুখের প্রতিশ্রুতি নিয়ে এসেছে ধর্ম। প্রভুর বেত্রাঘাতে ক্ষত-বিক্ষত দাস..... হাত তার শৃঙ্খলিত, কণ্ঠ তার রুদ্ধ, যুগে যুগে প্রতিবাদ জানিয়েছে চোখের জলে..... 'কুম্বাইয়া মিলর্ড' 'কাম বাই, হিয়ার মি লর্ড.....' দেখা দাও, দেখা দাও প্রভু। আর তো পারি না। এমনিভাবে চোয়াল লক্ষ্য করে ঘুঁষি পাকানো বলিষ্ঠ হাতকে, জোড় হাতে পর্যবসিত করতে পেরেছে 'ধর্ম'। 'স্রষ্টা'র কল্পনা, তার কাছে নালিশ করে সব দুঃখ উগরে দিয়ে শৃঙ্খলিত মানুষ পরের দিনের জন্য শক্তি সঞ্চয় করেছে। সুতরাং বঞ্চনা, শৃঙ্খল, দুর্দশা, অন্যের জন্য বাধ্যতামূলক শ্রম ইত্যাদিগুলো না থাকলে 'ভয়' বা 'ধর্ম' কিছুই থাকবে না।

কল্পনার একটা জগৎকে আরও রহস্যময় করে তোলার জন্য সমাজে একদল মানুষের সৃষ্টি করা হয়। তাঁরা হন, সেই জগৎ এবং এই জগতের সেতু—ধর্মগুরু, দূত,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পয়গম্বর। এই মানুষগুলোর পায়ে মানুষ সমস্ত কিছু বিসর্জন দেয়।

অতীত ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যায়, একদল মানুষকে, দিনের পর দিন, প্রকৃতি এবং পরিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে আত্মনিগ্রহের মধ্যে রাখা হত। এই রকম অবস্থার ফলে, সেই মানুষগুলো অমূলক প্রত্যক্ষের (হ্যালুসিনেশনের) রুগীতে পরিণত হতো। এই সমস্ত মানুষের অস্বাভাবিক, আচার, আচরণ তাদেরকে ধর্মগুরু বা ধর্মপ্রবর্তক করে তুলতো। প্রাচীন গ্রীক-সাহিত্য-বিশেষজ্ঞ চিন্তাবিদ জর্জ থমসন প্রাচীন গ্রীসের সমাজে পুরোহিত এবং ধর্মগুরু তৈরির করার প্রক্রিয়ার একটা চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন তাঁর 'ঈস্কাইলাস এবং প্রাচীন গ্রীস' গ্রন্থে।

ডাক্তার সেন বনাম ডাক্তার হাজরা সাঁপুই

তাহলে দেখা যাচ্ছে ধর্ম বলে প্রচারিত বস্তুটার দুটো ধারা (এক) প্রাতিষ্ঠানিক আচার, যেটা রাষ্ট্র এবং সমাজের কর্তৃত্বকারী সম্প্রদায়ের সঙ্গে হাত ধরাধরি করে চলে। মানুষকে লুট করার কাজের যুক্তি হিসাবে কাজ করে। সে এটা করতে পারে কারণ (দুই) মানুষের মধ্যে স্বতঃস্ফূর্তভাবে একটা ধর্মীয় ধারা কাজ করে। যেটাকে আমরা বলতে পারি লোকায়াতিক আচার। এটা মানুষকে তার দৈনন্দিন জীবনের দুর্বিষহ বোঝা টানার সান্ত্বনা হিসাবে কাজ করে এবং শক্তি জোগায়। দুর্দশার বিরুদ্ধে নালিশ।

যেমন যেমন মানুষ শ্রেণী সংগ্রামের ময়দানে নেমে অন্য মানুষের সঙ্গে অন্বিত হয়ে সামাজিক বিচ্ছিন্নতা কাটিয়ে, নিজেদের নতুন করে আবিষ্কার করে এবং পুনরুৎপাদন করে, ধর্মের দুটো ধারা পরস্পরের সঙ্গে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মধ্যে প্রবেশ করে। যদি কোন ক্ষেত্রে লোকায়াতিক ধারার নতুন সম্প্রদায়টা ক্ষমতায় আসে, তার সঙ্গে জড়িত আচার এবং ধর্মটাও প্রাতিষ্ঠানিক হয়ে যায় তার লোকায়াতিক চরিত্র হারিয়ে ফেলে, (কারণ তার মধ্যেই সেটা ছিল)।

দুটো ধারায় আন্তর্বস্তুতে সমাজ-প্রগতির অন্তরায়। ভাববাদী প্রাতিষ্ঠানিক ধারাটা আধি-ভৌতিক, অন্যদিকে লোকায়াতিক ধারাটা বাস্তবের উল্টো রূপকল্প। নিজের চারপাশে একটা রহস্যের জাল তৈরি করা।

দুটো ধারারই কৌশল বা মোডাস অপারেন্ডি হল, হিস্টিরিয়া তৈরি করে প্রক্ষোভগুলো বার করে দেওয়া এবং নতুন প্রক্ষোভ তৈরি করা। জর্জ থমসন তাঁর 'ঈস্কাইলাস অ্যাণ্ড এথেন্স' গ্রন্থে কোরিবানটাস বলে একটা গুপ্ত সম্প্রদায়ের কথা উল্লেখ করেছেন। যারা সংগঠিত ধর্মীয় সম্প্রদায়ের হাত থেকে নিজেদের রক্ষার জন্য গোপনে সংগঠিত হয়ে শাসক এবং নির্যাতনকারীদের সাংস্কৃতিক প্রভাব থেকে দূরে থাকতো। 'কোরিবানটাস'দের ধর্মীয় আচার এক ধরনের 'ভৈরব নৃত্য' (আমাদের দেশের হিন্দু ধর্মের বিভিন্ন সংগঠনের মধ্যে—যেমন আনন্দমার্গী, শৈবদের মধ্যেও দেখা যায়)। ড্রাম, ফ্লুট সহযোগে এই গণ-নাচের উদ্দেশ্য একটাই—জনতার মধ্যে জমা প্রক্ষোভগুলোকে নিষ্ক্রমণের পথ করে দেওয়া। স্বাভাবিকভাবেই এই সমস্ত কাজ পরিচালনার জন্য এক ধরনের অস্বাভাবিক মানুষ (নিউরোটিক) তৈরি করা হয়ে থাকে প্রথম দিকে। এরা সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয়ে পাহাড়ের গুহায় বা অন্য কোন নির্জন স্থানে বসে দিনের পর দিন তপস্যার নামে আত্ম-নিগ্রহ (অটোসাজেশন) চালিয়ে যান। ফলে মস্তিষ্কের একটা বিকৃতি ঘটে। তারা নিউরোটিক অবস্থা প্রাপ্ত হয়। এরা হয় আদিম ধর্মগুরু। পরে পেশাটা বংশগত হয়ে যায়। গণ-হিস্টিরিয়া তৈরির ক্ষেত্রে এই অস্বাভাবিকতা বেশ কার্যকরী ভূমিকা পালন করে। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময়ে যে গণ-প্রক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ দেখা যায়, একদল মানুষ উন্মত্ত এবং রক্ত- পিপাসু হয়ে ওঠে, তার কারণও এই গণ-হিস্টিরিয়া। এটা সংগঠিত করে ধর্মমত নিজেই। তাই, গুণ্ডারা বা দাঙ্গাবাজরা দাঙ্গা করে কিন্তু তার যুক্তি সরবরাহ করে থাকে ধর্ম এবং পণ্ডিতরা।

এই সমস্ত পণ্ডিতরা প্রথমত মানুষকে ভুলিয়ে দিতে চাইছে আল্লাহ্-ই হোক, ব্রহ্মা-ই হোক বা 'গড'ই হোক দুধরনের — একজন গরীবের, যাকে তারা নিজেদের দুঃখ-বেদনার বাস্তবের সঙ্গে মিলিয়ে নেন, এবং তাঁদের মুক্তির প্রতীক বলে মনে করেন, অন্যজন বড়লোকের আল্লাহ্ বা ব্রহ্মা যাকে বড়লোকেরা গরীবদের দুঃসহ অবস্থাটা মানিয়ে নেবার কাজে ব্যবহার করে। ধর্ম-আন্দোলনের ইতিহাসেও এই দুই ধারার উল্লেখ আমরা দেখতে পাই। অধিকাংশ ধর্ম-আন্দোলনই কিন্তু রাজনৈতিক ক্ষমতাকে লক্ষ্য রেখেই পরিচালিত হয়। ধর্ম-আন্দোলনের ফলে গরীবের 'খোদা' জয়লাভ করেই নিজের মতো করে প্রাতিষ্ঠানিক হয়ে পড়ে। অবস্থানটা পাল্টে যায়। ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহারের নামই সাম্প্রদায়িকতা। এটা যুগে যুগেই ঘটেছে। সম্রাট অশোক তো 'বুদ্ধ'কে ভগবান বানিয়ে বৌদ্ধ ধর্মকে রাষ্ট্র ধর্ম বানিয়ে ফেলেছিলেন। এবং তিনি কিন্তু ভারতীয় রাষ্ট্রনীতিবিদ বা প্রথাগত ঐতিহাসিকদের নিকট ধর্মাশোক নামে প্রশংসিত।

ধর্মের এই রাজনীতিকরণ আধুনিক যুগে বেশী বেশী করে হচ্ছে। কারণ আধুনিক যুগটা হল পণ্য উৎপাদনের যুগ। অর্থাৎ উৎপাদকের কাছে তার উৎপাদিত বস্তুর কোন রকম ব্যবহারিক মূল্য নেই। সে উৎপাদন করে সম্পূর্ণ অন্যের জন্য। এমন কি উৎপাদক মানুষ নিজেই পণ্য হয়ে যায়। এই অবস্থায় মানুষের মস্তিষ্কের স্নায়ুসংস্থা অতি-স্ববিরোধী (আলট্রা-প্যারাডক্সিকাল) চরিত্র গ্রহণ করে। মানুষ একটা অদ্ভুত অস্থিরতায় ভোগে। আত্মবিচ্ছিন্ন এই মানুষের সমস্ত জৈবিক ক্রিয়া (পান-ভোজন-প্রজনন) তখন যান্ত্রিক ক্রিয়াতে পরিণত হয়। জৈবিক ক্রিয়াকলাপ ছাড়া অন্য সমস্ত বিষয়ে সে নিস্পৃহ হয়ে পড়ে। এই আলট্রা-প্যারাডক্সিকাল অবস্থার জন্য মানবিক ব্যাপারগুলোই পাশবিক মনে হয়। পাশবিক ব্যাপারগুলো মানবিক বলে প্রতিভাত হয়। 'What is animal becomes human and what is human becomes animal'. পশুধর্মগুলোই (বিবর্তনের সূত্রে সঞ্চিত) জিঘাংসা, রিরংসা, আক্রমণ-প্রবণতা মানবধর্ম (মানুষের চিরায়ত চরিত) বলে প্রচারিত হতে থাকে। এই রকম একটা সাধারণ বাতাবরণে একদল মানুষকে হিস্টিরিয়াগ্রস্ত করে তোলা খুবই সহজ।

কারণ প্রত্যেকটা প্রাণীই শর্তহীন পরাবর্ত হিসাবে, দুটো মৌলিক পরাবর্তের অধিকারী। (এক) আত্মরক্ষার পরাবর্ত (দুই) প্রজাতিকে রক্ষার জন্য নিজের অস্তিত্ব বিপন্ন করার পরাবর্ত। [মানুষের মধ্যে এই দুটো ছাড়া অতিরিক্ত আর একটা পরাবর্ত 'পারপাস

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রিফ্লেক্স' কাজ করে। প্রাণীজগতের মধ্যে অন্য কোন প্রাণীতেই এই রিফ্লেক্সটা কাজ করে না। যত উন্নত ধরনের প্রাণীই হোক না কেন, লক্ষ্য অর্জনে সে সাড়া দিতে পারে না। নদীর অন্যপারে কলাগাছে পাকা কলা দেখলে, এপার থেকে একটা বাঁদর বা শিম্পাঞ্জি কোন সময়েই একটা নৌকা বা ভেলা নিয়ে নদীটা পার হয়ে কলার কাঁদিটা পাবার উপায় ভাবতে পারে না। কিন্তু যদি কোন মানুষকে সে দেখে নৌকা পার হয়ে কলার কাঁদি থেকে কলা ছিঁড়ছে, তারপর সে বড়জোর সেটা অনুকরণ করতে পারে মাত্র।

যদি দ্বিতীয় পরাবর্তটা দিয়ে লক্ষ্য পরাবর্তটাকে শর্তাধীন করে তোলা যায় তাহলে আত্মসর্বস্ব মানুষও আত্মত্যাগে ভীত হয় না। আত্মরক্ষার জন্যই প্রয়োজনে আত্মত্যাগ এবং আত্মসমীকরণ। কোন দল, গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের সঙ্গে আত্মসমীকরণ ব্যতীত নিরাপত্তা বোধ জাগে না। ব্যক্তি—নিরাপত্তা বোধ ব্যাহত হয় যখন কেউ ভাবে তার দল, গোষ্ঠী বা সম্প্রদায় আক্রান্ত। এই আঘাত যত ভয়ঙ্কর হয়, ব্যক্তিমানুষের আচরণ, বিদ্যাবুদ্ধি সব কিছুই বিশৃঙ্খল হয়ে যায়। আত্মবিলুপ্তির ভয়ে সব স্তিমিত হয়ে পড়ে। দ্বিতীয় সংকেত (ভাষা)-এর প্রভাবে মানুষকে এই আশঙ্কায় অভিভূত করা যায়। ব্যক্তি স্বার্থোত্তীর্ণ যূথ বা দল-কেন্দ্রিক বর্বরতা সংঘটিত করেও তারা লজ্জিত হয় না। এই বোধ (নিরাপত্তাহীনতা) থেকেই তথাকথিত আততায়ীর সঙ্গে তার সম্পূর্ণ বিযুক্তি ঘটে। স্বাভাবিক অবস্থায় তার সঙ্গে যে সামাজিক মানবিক সম্পর্ক ছিল সেটা ভেঙে যায়। ছিন্ন হয়ে যায় মানুষে মানুষে আত্মিক সম্পর্ক। প্রতিপক্ষ তখন অমানুষ হয়ে সামনে আসে। সমীকৃত গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়টাই তখন প্রজাতির স্থান দখল করে নেয়। তাই সত্যিকারের প্রজাতির একটা অংশকে ধ্বংস করতে বেদনা বোধ হয় না। সহজাত ধ্বংসাত্মক প্রবৃত্তি কিন্তু এর জন্য দায়ী নয়। এর আসল উৎসটা কিন্তু সহজাত রক্ষণাত্মক প্রবৃত্তি। আসলে আত্মসমীকরণের গণ্ডগোল।

'ধর্ম'কে কাজে লাগিয়ে যুগে যুগে একদল মানুষ এই কাজটা করে গেছে। কারণ ফ্যাসিবাদ বা নাৎসীবাদের মূল রণধ্বনি যুক্তি নয়, বিশ্বাস। যুক্তি দিয়ে যখনই কেউ কল্পিত ভয়ের আসল কারণ অনুসন্ধানে ব্রতী হবার চেষ্টা করেছে ফ্যাসিস্তরা তাকে নিকেশের আহ্বানই দিয়েছে। ১৯৩৪ সালে, এই সমস্ত 'বন্ধ্যা বুদ্ধিজীবী'দের জাতির এবং মননশীলতার পক্ষে বিপজ্জনক চিহ্নিত করে, মুসোলিনি তো সরাসরি খতমের ওকালতি করে। ৩৫ সালে হিটলার ন্যুরেমবার্গ নাৎসি সম্মেলনে 'চুল চেরা বুদ্ধির বদলে জার্মান হৃদয় এবং বিশ্বাস আর অন্তরের ডাক'এর স্তুতি করে। এর সঙ্গে হিন্দু ফ্যাসিবাদীদের আক্ষরিক সাদৃশ্যটা বেশ লক্ষণীয়। একটা সম্প্রদায়কে গোষ্ঠীবদ্ধ করে, নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করতে গেলে স্বাভাবিক ভাবেই একটা গোটা সম্প্রদায়কেই শত্রু হিসাবে চিহ্নিত করতে হবে। কুকুরটাকে পাগলা না সাজিয়ে মারা যায় না। আধুনিক ফ্যাসিবাদ খুব দক্ষতার সঙ্গেই এই কাজটা করে থাকে। প্রথমে মানুষকে বোঝাতে হবে শত্রু আগ্রাসী, ধ্বংস করে দিতে উদ্যত। এই আতঙ্কের ছবি আঁকতে হয় তাদের। (অনার্যদের সম্পর্কে আর্য সাহিত্যগুলোর বিশেষণ থেকে এটা বেশ ফুটে ওঠে। মুসলমানদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কোরান হদিশেও একই ভাষায় শত্রুর বীভৎস রূপ সৃষ্টি করা হয়েছে)। আধুনিক ফ্যাসিবাদীরা, অতীতের কোন একটা গল্প-কথা, বা উপকথা কিম্বা বিচ্ছিন্ন একটা ঘটনাকে মিথ্যের রঙে রাঙিয়ে বর্তমান বানিয়ে প্রচারের সর্বাধুনিক কৌশলকে কাজে লাগিয়ে (দ্বিতীয় সংকেতের প্রভাব) একদল মানুষকে যূথবদ্ধ করে থাকে। (হিটলারের আধুনিক বিজ্ঞানকে রক্তের বিশুদ্ধতা রক্ষার কাজে ব্যবহার করা এবং গোয়েবলস্-এর প্রচারের গুরুত্ব তত্ত্ব)। এই কাজের সঙ্গে সঙ্গেই শত্রুর থেকে নিজেকে শ্রেষ্ঠ বলে ভাবতে মানুষকে প্ররোচিত করা। হিটলার যেমন ইহুদী নিধনের অজুহাত হিসাবে যুক্তি এনেছিল তারা সর্বগ্রাসী, তারা সুবিধাভোগী। ভারতবর্ষের হিন্দু ফ্যাসিবাদীরাও একই কায়দায় ভারতীয় মুসলমানদের সুবিধাভোগী একদল মনুষ্যেতর জীব হিসাবে ঘৃণার বস্তু করে তুলেছে। যদিও, সেই সময়কার জার্মান ইহুদীদের বুদ্ধিবৃত্তি, দক্ষতা, অর্থনৈতিক বিকাশের সঙ্গে তুলনা করলে ভারতীয় মুসলমানদের করুণ অবস্থানটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। মতাদর্শের দিক থেকে অতীতে ফিরে যাওয়াটাই ফ্যাসিবাদের সংস্কৃতি। (অর্থাৎ ফ্যাসিবাদী সংস্কৃতির সামাজিক লক্ষ্য একদল প্রবৃত্তিসর্বস্ব হিংস্র জীব তৈরি করা)। এরই জন্য ধর্মকে সে হাতিয়ার হিসাবে গ্রহণ করে থাকে। প্রয়োগের ক্ষেত্রেও দেখা গেছে, মানুষের একাংশের মধ্যে জিঘাংসা জাগিয়ে তোলার জন্য তারা অতীতের কোন গল্প-কথা, বা অতিকথাকে সত্য বলে বিরুদ্ধ পক্ষের ঘাড়ে সেই অপকর্মের দায়িত্বটা ফেলে দিয়ে খুন করার যুক্তি খোঁজে। হিটলারের বাহিনীরা ইহুদী মারার কারণ ইহুদীরা নাকি যীশুকে ক্রুশবিদ্ধ করেছিলেন। অতীতের ইহুদীদের কৃতকর্মের দায়িত্ব বহন করতে হতো জার্মান ইহুদীদের। এখানেও মুসলমানদের 'বাবরকা আওলাদ' বলে খুন করার যে হুমকি সেটাও একই জিনিস। বাঙলাদেশে আবার ইতিহাসের হিন্দুরা কেন মুসলমান মারছে এই অজুহাত।

মোদ্দা কথায়, একই মতাদর্শ, একই প্রয়োগবিধি। মতাদর্শের জগতে শর্তহীন বিশ্বাসই প্রধান। প্রয়োগে 'ব্যাটল অব অ্যাট্রিশন'। না হলে জাতি ধ্বংস হয়ে যাবে। অর্থাৎ আত্মরক্ষার জন্য আত্মত্যাগে শর্তাধীন করে তোলা। আতঙ্ক এখানে প্রধান উপাদান। এটা গ্রহণযোগ্য করে তোলার জন্য ইতিহাসের জায়গায় আসে কল্পগাথা এবং আচার। ঘটে ইতিহাসের বিকৃতি।

কেন ফ্যাসিবাদ

সমাজ-বিকাশের ধারাতে দেখা গেছে, উৎপাদিকা শক্তির ক্রমাগত বিকাশ উৎপাদন সম্পর্কের পরিবর্তনের দাবী নিয়ে বারবার সামাজিক ভিত এবং কাঠামোটাকে পাল্টে দিয়েছে। প্রথম প্রথম এটা সমাজের অনুৎপাদকরাই হাতিয়ার করে একদল, অন্যদলকে হটিয়ে সমাজ-বিকাশের ধারাকে অব্যাহত রাখতো। সমাজে প্রতিষ্ঠিত (কর্তৃত্বকারী) সম্প্রদায়টার বিরুদ্ধে ক্ষমতা-লিপ্সু নতুন সম্প্রদায়ের এই সংগ্রামে সাধারণ মানুষকে সংগঠিত করার জন্য নতুন সম্প্রদায়টাকে সৃষ্টি করতে হয়েছিল, নতুন দর্শন, নতুন সংস্কৃতি, নতুন ধর্ম। স্বাভাবিকভাবেই কর্তৃত্বে আসীন সম্প্রদায়টা তখন, চিরায়ত, শাশ্বত ইত্যাদি ধারণা এবং সমস্ত প্রাতিষ্ঠানিক সংগঠনগুলোকে প্রবল উৎসাহের সঙ্গে রক্ষা করতো। এই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দ্বন্দ্ব একেবারে গুণগতভাবে নতুন রূপ পায় আধুনিক যুগে প্রবেশ করে। আধুনিক যুগ বলতে আমরা সেই যুগকে বোঝাচ্ছি যখন, পণ্য উৎপাদন ব্যবস্থাটা তার সম্পূর্ণতা লাভ করে। এমন কি উৎপাদক মানুষ নিজেই পণ্যে পর্যবসিত হয়। উৎপাদনের হাতিয়ারের অভিনব বিকাশের ফলেই এটা ঘটে। পাশ্চাত্যের শিল্প বিপ্লবের সময় থেকেই আমরা এই যুগটা ধরতে পারি। উৎপাদনী শক্তির এই অভূতপূর্ব বিকাশ প্রতিষ্ঠিত সকল মতকেই চ্যালেঞ্জ জানালো। চিন্তার ভিত্তি হিসাবে প্রকৃতি বিজ্ঞান এবং যুক্তিবাদ এসে ধর্মমতকে পরিবর্তন করার দাবী জানায়। উৎপাদিকা শক্তির বিকাশ নতুন সম্পর্কের দাবী করে। সামাজিক কর্তৃত্ব (রাষ্ট্রের মাধ্যমেই যার সর্বোচ্চ প্রকাশ ঘটে) দখলে অগ্রণীর ভূমিকা পালনে এগিয়ে আসে একটা সম্প্রদায়। 'স্বাধীনতা', 'সাম্য', 'মৈত্রী', স্লোগানের ওপর নির্ভর করে তারা সংগ্রামে নামে। মানুষ, জমি এবং কর্তৃত্বে সমানাধিকার ছাড়া নতুন এই সম্প্রদায়টার বিকাশ অসম্ভব। শিল্পবিপ্লব দাবী করে শ্রমিক মানুষ। জমির সঙ্গে আষ্টে-পৃষ্ঠে যদি মানুষ বাঁধা থাকে, শিল্প-শ্রমিক পাওয়া মুশকিল। সুতরাং মানুষের অবাধ সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্যই এই স্লোগান তাদের হাজির করতে হয়। এবং এর উপযোগী সংস্কৃতি, দর্শন এবং ধর্ম গড়ে তুলতে হয়। মানুষের চরিত্র কেমন? বার বার এই প্রশ্নটা সেই সময় এসে পড়ে। তারা প্রমাণ করার চেষ্টা করে মানুষ কোন 'শাশ্বত' জীব নয়। 'রোমান্টিক' চরিত্রটাই মানুষের চরিত্র। অমিত শক্তির আধার। ইচ্ছাপূরণের স্বপ্নে উজ্জীবিত একটা প্রাণী। স্বপ্ন দেখতে পারা প্রাণীটার নামই মানুষ। রেনেসাঁ, রিফরমেশন শিল্পবিপ্লবের সাংস্কৃতিক পটভূমিকা তৈরি করে। এই যুগটাকেই আমরা ধনতন্ত্রের যুগ বলে চিহ্নিত করে থাকি। যখন উৎপাদন হয় বাজারের জন্য, উৎপাদিত বস্তুকে বাজারের মাধ্যমেই ভাগ্য হতে হয়। উৎপাদনের লক্ষ্য থাকে সর্বোচ্চ মুনাফা। পুরানো কর্তৃত্বকারী সম্প্রদায়টাকে ক্ষমতা থেকে হটিয়ে এই অভিমুখেই সমাজ পরিচালনা করতে শুরু করা হয়। ধর্মের 'অনড়', 'অটল' মতাদর্শ কিছুটা ধাক্কা খায়। ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত এটা চলতে থাকে। কিন্তু নতুন এই ব্যবস্থা গোটা সমাজটাকেই সরাসরি দুটো ভাগে (মূলত) ভাগ করে দেয়। যন্ত্রের বিকাশ এবং নতুন শ্রম বিভাগের ফলে উৎপাদন হয়ে দাঁড়ায় সামাজিক। অর্থাৎ কোন একটা পণ্য এখন আর কোন একজনের শ্রমের ফসল নয়। সমগ্র সমাজের ফসল। উৎপাদনের এই সামাজিক চরিত্রটা উৎপাদনকে অতীতের তুলনায় কয়েক হাজার গুণ বেশি বাড়িয়ে দিলো। এর ফলে দেখা দিলো সংকট। উৎপাদনের চরিত্রটা তো সামাজিক কিন্তু ভোগটা রয়ে গেল ব্যক্তিগত। এই অবস্থা স্বাভাবিকভাবেই সামাজিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে নতুন বিন্যাসের দাবী নিয়ে উপস্থিত হয়। এই প্রথম দাবী ওঠে মালিকানাটাও সামাজিক করতে হবে। না হলে অতি-উৎপাদনের এই সংকটে সমাজটাই হাবু-ডুবু খাবে। এই দাবীর সামনা-সামনি পড়ে সামাজিক ক্ষেত্রে কর্তৃত্বকারী নতুন সম্প্রদায়টা তার 'প্রাতিষ্ঠানিক' রূপ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করতে থাকে। সংকট মুক্তির জন্য বাজারের খোঁজে বের হতে হয় তাকে। প্রভুত্বের জোরে নিজের ছাঁচের জল, অন্যের উঠোন ভাসিয়ে বার করে দেবার চেষ্টা চালায়। যুক্তিবাদ এবং বিজ্ঞানকে সামনে রেখে যারা ক্ষমতায় এসেছিল, যারা ভগবানের বিরুদ্ধে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শয়তানের হিম্মত নিয়ে বিদ্রোহ করে পৃথিবী আবাদ করতে নেমেছিল এবং সেদিনকার স্বর্গরাজ্য থেকে বিতাড়িত সেই সম্প্রদায়টাই প্রভুত্ব-তত্ত্ব স্বীকার করানোর জন্য ধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করে। আধুনিক বুর্জোয়ারা সামন্তবাদের কোলে ঢলে পড়ে। এবং সাংস্কৃতিক জগতে একটা প্রতিক্রিয়ার অভ্যুত্থান ঘটে। যুক্তিবাদ বর্জিত হয়। ১৮৪৮ সালের বিপ্লবের পর বুর্জোয়ারা আরও প্রতিক্রিয়াপন্থী এবং আরও স্থবিরতার উপাসক হয়ে ওঠে। হেগেল বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রাজতন্ত্রের মহিমা কীর্তন শুরু করেন। যুক্তিবাদের জায়গায়, ইচ্ছাশক্তির সর্বস্বতা ঘোষণা করেন। মানুষকে দুনিয়া সম্পর্কে মোহমুক্ত করানোর মহান দায়িত্ব ঘাড়ে নিয়ে তিনি শিল্প-সাহিত্যের ক্ষেত্রে 'স্বাজ্ঞা' এবং নির্লিপ্ততাকে মহান নন্দনতত্ত্ব হিসাবে হাজির করেন। 'নির্বাণে'র রহস্যময় মতাদর্শ 'চরম সমাহিত ভাব' এবং 'বাঁচার ইচ্ছাকে হত্যা' এই নিয়েই তিনি যুক্তির ভাঁড়ার সাজাতে থাকেন। বৌদ্ধ দর্শন (বেদান্ত) প্রভাবিত তাঁর মত একসময়ে ভারতীয় পণ্ডিতদেরও খুব প্রভাবিত করেছিল, এবং ইউরোপের শাসকদের প্রতিক্রিয়াশীল অংশকেও সংগঠিত করে।

নীৎসে বুঝতে পারলেন, পরশ্রমজীবী যে সম্প্রদায়টা কর্তৃত্বের আসনে অধিষ্ঠিত অর্থাৎ বুর্জোয়ারা যে নীতিবাদ দিয়ে ক্ষমতায় এসেছে এই সংকটের মোকাবিলা করার ক্ষমতা সেই নীতিবাদের (এথিক্স) নেই। তাই খ্রীষ্টধর্মের প্রেমের তত্ত্বকে সরাসরি তিনি নাকচ করে শোপেনহাওয়ারের মারফত ভারতীয় ব্রাহ্মণ্যবাদের বর্ণশ্রেষ্ঠত্বের তত্ত্ব হাজির করলেন। উচ্চতর শ্রেণী দুর্বলতর এবং অধীনস্থ শ্রেণীকে শাসন করবেই এটাই প্রকৃতির নির্দেশ। তাঁর মতে বাঁচার জন্য সংগ্রাম এবং শক্তি-লাভের স্পৃহা মানুষের সনাতন প্রবৃত্তি। এখান থেকেই আসে তাঁর 'সুপারম্যান তত্ত্ব'। তাই নীৎসেকে বলা যেতে পারে সাম্রাজ্য সম্প্রসারণের যুগের তাত্ত্বিক। বার্গসঁ দেখালেন যুদ্ধ একটা প্রাকৃতিক নিয়ম। নীৎসে যে এশিয়া আফ্রিকার কালো বর্বর মানুষদের পাশ্চাত্যের সুসভ্য জগতের সেবায় নিয়োগের মধ্যে কোন দোষ দেখেন নি, বার্গসঁ সেটাকে প্রাকৃতিক নির্দেশ বলেই ভেবেছেন। অন্যদিকে আবার জর্জ সোরেল, মিথ সৃষ্টি করে হিংস্রতার দ্বারা ক্ষমতা দখল করাটাকে যুক্তি সিদ্ধ করেন। স্পেংগলার দেখান, ধনতন্ত্রের এই সংকট কাটানোর উপায় পুরানো প্রুশিয়ান জঙ্গীবাদ, রাজতন্ত্র এবং অভিজাত শাসনের পুনরাবির্ভাবের মধ্যেই সম্ভব।

তাহলে দেখা যাচ্ছে ধনতন্ত্র সংকটের মুখে পড়ে যখন ধ্বংসের কিনারায় অর্থাৎ পুরানো সম্পর্কটা ভেঙে পড়ছে, অথচ নতুন সম্পর্কটার আবির্ভাবকে জোর করে ঠেকিয়ে রাখার চেষ্টা চলছে, সেই সময় অতীতের কাছে আত্মসমর্পণের প্রক্রিয়ার মধ্যেই ফ্যাসিবাদের দর্শনটা নিহিত রয়েছে। ধর্ম তাতে জুগিয়েছে প্রাণ। রাষ্ট্র এবং রাজনীতিই হচ্ছে তার শক্তি। রাষ্ট্রের ধর্মের কাছে আত্মসমর্পণই এর লক্ষণ। তাই, ফ্যাসিবাদের দর্শন আসলে হচ্ছে অযুক্তির দর্শন। প্রবৃত্তির সৃষ্টি করা একটা 'মিথ', এটাকে 'বিশ্বাস' করেই বিশ্বাস করতে হয়। ফ্যাসিবাদের এই দার্শনিক ভিতের যুক্তি খুঁজে পাওয়া যায়, জেমস-এর 'সত্যাসত্য নির্ণয় অসম্ভব ব্যাপার এর মধ্যে।' বাস্তব সত্য বিচারের পদ্ধতি আমাদের আয়ত্তের বাইরে। সুতরাং যেটাকে আমরা সত্য বলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিশ্বাস করি সেটাই সত্য। বিশ্বাস-ই সত্য ঘটনা তৈরি করতে পারে (এই সব তত্ত্বের মধ্যে)। সুতরাং ফ্যাসিস্ত দর্শন, হিন্দু আর্যদের বিশ্বাস, এবং আরব মুসলমানদের ইমান-এর সমান একটা মতাদর্শ। যার মূলকথা: যেটা জীবনের পক্ষে লাভজনক সেটাই সত্য। সেই ব্যবহারই ন্যায়-সঙ্গত যেটার উপযোগিতা আছে....(জেমস)। সুতরাং ফ্যাসিবাদী দর্শন একাধারে ভাববাদী জঞ্জাল, অন্যদিকে কদর্য বাস্তববাদ... (বস্তুবাদ নয়)। তাই ভগবান আর তার ফলিত বিজ্ঞানের সমন্বয়েই এটা গড়ে ওঠে। এর সামাজিক প্রয়োগ চরম ভোগবাদ। নীতিবিজ্ঞানে ভালো মন্দের (বিয়ণ্ড গুড অ্যাণ্ড ইভিলস্) উপরে (নীৎসে এবং বিবেকানন্দ)। মানসিক ভাবে যদি কেউ একবার এই অবস্থা অর্জন করতে পারে তার কাছে খুন, ধ্বংস, প্রভুত্ব করা, সব কিছুই গ্রহণীয় হয়ে ওঠে।

পুঁজিবাদকে টিঁকে থাকতে হলে পুঁজিবাদীরা ক্রমাগত মুনাফা বৃদ্ধি ছাড়া টিঁকে থাকতে পারে না এবং এই ক্রমাগত মুনাফা বৃদ্ধির ব্যাপারটা ঘটে মানুষকে নিষ্ঠুর শোষণের মাধ্যমেই। তাদের শ্রমশক্তির ওপর চরম প্রভুত্ব থেকেই এটা করা সম্ভব। সুতরাং মানুষকে বোঝাতে হবে এটা স্বাভাবিক। প্রয়োগবাদের বা প্র্যাগমাটিজ্‌ম্-এর সরল গ্রহণযোগ্যতার একটা দিক আছে যেমন, বিড়ালের রঙ সাদা না কালো দেখার দরকার নেই, ইঁদুর ধরতে পারলেই হল, সূর্য পূর্ব দিকে ওঠে, পশ্চিমে ডোবে..... সাধারণ ভাবে খুব সত্যি কথা। কিন্তু কালো রঙের বিড়ালটা যদি ডিপথেরিয়ার বাহক হয়, নিশ্চয় 'ইঁদুর' ধরার জন্য সেটা কেউ নিয়োগ করবে না, করবে কি? মধ্যবিত্ত দরিদ্র পিতার সুন্দরী কন্যা, অভাবে তার সৌন্দর্য নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, তাকে সালঙ্কারা দেখার জন্য কোন পিতা কি তার মেয়েকে রাজস্থান নিবাসী কোন মাড়োয়াড়ি বেওসায়ী-র উপপত্নী করতে রাজী আছেন? এই প্রশ্নের উত্তরে প্রত্যেকেই জোরে আপত্তি জানিয়ে বলবেন, 'না'। কিন্তু যখনই ইঁদুরের তত্ত্ব তুলে তাঁদের বলা হয় কলকাতা একটা নোংরা শহর, চারদিকে আবর্জনা, লোকে ফুটপাতে থাকে, বিশ্বব্যাঙ্ককে দিলে তারা সেটা সুন্দর করে দেবে। একদল মানুষ তখনই সেই ইঁদুরতত্ত্ব তুলে সমর্থনে এগিয়ে আসবে....। তাঁরা ভুলে যাবেন, ইংরেজও এই রকমভাবে ব্যবসা করতে এসেই ফোর্ট-এর জমি চেয়েছিল। শেষে দেশটাই চলে গিয়েছিল... যার জের এখনও চলছে। সূর্য যে ওঠেও না ডোবেও না, পৃথিবীটা ঘোরে, এই সত্যটা তো দৈনন্দিন দেখা যায় না। সাধারণভাবে মানুষ এগুলো নিয়ে ভাবে না, বাস্তববাদ বা প্রয়োগবাদের এই সরল গ্রহণ-যোগ্যতাটা থাকার জন্য ফ্যাসিবাদ সেটাকে সুন্দর ভাবে কাজে লাগায়। সাধারণ ভাবে এই সমাজে আত্মবিচ্ছিন্ন মানুষকে যে কেউ দেখে অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামে প্রত্যেকেই পরস্পরের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করছে। ঈর্ষা, দ্বেষ, স্বার্থপরতা প্রতিমুহূর্তের ঘটনা সুতরাং এগুলোকে যদি মানুষের সাধারণ চরিত্র বলে চিত্রিত করা হয় মানুষ অস্বীকার করতে একটু দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়বে। তার পক্ষে সেই মুহূর্তে ভাবার সুযোগ নেই। না এটা মানুষের সাধারণ চরিত্র ছিল না। এই আত্মবিচ্ছিন্ন মানুষ সৃষ্টি হয়েছে আর্থ-সামাজিক বিকাশের একটা স্তরেই... সাদা চোখে এগুলো দেখা যায় না বলেই মানুষকে এই রকম চিহ্নিত করা এবং কদর্য বস্তুবাদের আড়ালে ভগবান বা ধর্ম-কে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জায়গা করে দেওয়া সম্ভব হয়। মানুষের চিন্তা প্রক্রিয়ার মধ্যে যদি বস্তুটাকেই আলোচ্য বা চিন্তার বিষয় করা যেতে পারে, বস্তুর 'শাশ্বত' রূপটাকেই তাহলে প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে। এবং এটা করা যেতে পারে, কারণ যেগুলো সাদা চোখে দেখা যায় বা ব্যক্তি-মানুষের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা, এই রকম ভাবতে শেখা মানুষ কোন সময়েই কি, কেন, এবং কিসের জন্য এ প্রশ্ন তোলে না। ভাববাদ বা ধর্মীয় মতবাদ এবং কদর্য বস্তুবাদ বা প্র্যাগমাটিজ্‌ম্ এই রকমভাবে এক জায়গাতে মিলে যায়। রূপান্তরিত বস্তু বা তাৎক্ষণিক একটা ঘটনা বা দৃষ্টান্তই তাদের প্রমাণ হিসাবে কাজ করে। তারা কখনই প্রক্রিয়াটাকে চিন্তা জগতের ত্রি-সীমানায় ঘেঁষতে দেয় না, মানুষকে ভাবাতে শেখায় না, এই বস্তুটা কি করে এই বস্তু হল? কেন ওটা 'সেই বস্তুটা' হল না? ভাবলেই দেখতে পেত, বস্তুটা এই অবস্থানে চিরকাল ছিল না। পরিবর্তিত হতে হতে এই রকম হয়ে যেতে বাধ্য হয়েছে। প্রত্যেকটা বস্তুই (এখানে সমাজ, মানুষ সব কিছুকেই বস্তু বলে চিহ্নিত করা হচ্ছে) একটা প্রক্রিয়ার ফসল। তাদের অবশ্যই গতি, পরিবর্তন, বিকাশ এবং রূপান্তরের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করতে হচ্ছে। এর ফলেই 'ন-অস্তি' থেকে 'অস্তি'র সৃষ্টি।

পুঁজিবাদ, যেটা চরম অন্যায়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত, সে নিজের অন্যায় এবং স্বার্থপরতাকে যুক্তিসিদ্ধ করার জন্যই (কারণ তার মতে ন্যায় অন্যায় জানিনে, জানিনে/শুধু মুনাফারেই জানি....) এগুলোকে 'স্বাভাবিক ব্যাপার' 'চিরন্তন ব্যাপার' বলে ভাবতে শেখাচ্ছে। এর সঙ্গে ধর্মের যোগাযোগ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। তাই প্র্যাগমাটিজ্‌ম্ বা বাস্তববাদ হল পুঁজিবাদের প্রভুত্বকে গ্রহণ-যোগ্য করে তোলার দর্শন। এর ফলিত দিক মানুষ ভোগবাদে আকৃষ্ট হয়ে 'পণ্য-পূজারী' হয়ে উঠবে। তাই এটাকে বলা যেতে পারে 'বাজার-তৈরি'র সংস্কৃতি।

কিন্তু প্রত্যেকটা বস্তুর মতই বিকাশের নিয়মানুসারেই পুঁজিবাদী বিকাশও তার নিজস্ব কিছু সমস্যা তৈরী করে, সেটা আগেই আলোচনা করেছি। পুঁজিবাদকে টিঁকে থাকতে হলে অনবরত উৎপাদনের হাতিয়ারের বিকাশ সাধন করতেই হবে। উৎপাদন শক্তির বিকাশ তাকে ঘটাতেই হবে। এই উন্নতিই তার ধ্বংসের বীজ। এটা উৎপাদন সম্পর্কের পরিবর্তন দাবী করে। তখন পুঁজিবাদকে টিঁকে থাকতে হলে তিনটে পথের যে-কোন একটা গ্রহণ করতে হয় তাকে, (এক) ভোগ বা মালিকানাকে সামাজিক করে উৎপাদন সম্পর্কের পরিবর্তন ঘটিয়ে উৎপাদন শক্তির সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান। (দুই) না হলে উৎপাদন শক্তির বিকাশ স্তব্ধ করে দেওয়া। এই দুটোর কোনটাই করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। কারণ তাহলে তার নিজেরই মৃত্যু, সুতরাং সে তৃতীয় আর একটা পথ বেছে নেয়- বাজার দখল করে উদ্বৃত্তগুলোকে (এবং সংকট সহ সেখানে চালান করা)। প্রভুত্ব এবং কর্তৃত্বকে কাজে লাগানো। এই রকম ভাবে অর্থনৈতিক ক্ষমতা এবং রাজনৈতিক ক্ষমতা একাকার হয়ে যায়। উদ্দেশ্য — রাষ্ট্রশক্তিকে কাজে লাগিয়ে সংকটের মোকাবিলা করা। সামান্যতম বিরোধিতা সহ্য করার শক্তি সে হারিয়ে ফেলে। তার প্রচলিত নীতিবিদ্যার ঊর্ধ্বে একটা কিছু অবলম্বনের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। প্রভুত্ব কায়েমের জন্য সামাজিক প্রয়োগের ক্ষেত্রে তাকে তখন খুন, হত্যা, ধ্বংস, ষড়যন্ত্র,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উপনিবেশস্থাপন, অন্যের উপনিবেশ ছিনিয়ে নেওয়া ইত্যাদি গুলো করতে হচ্ছে (এবং তখন-ই আমরা বলছি ফ্যাসিস্ত হয়ে গেছে) তখন নীতিবিদ্যা বা সংস্কৃতির জগতে প্রেম, পরমতসহিষ্ণুতা, গণতান্ত্রিক অধিকার, বাঁচো এবং বাঁচতে দাও—এই সব নীতি সে সহ্য করতে পারে না। তার এই যুগের উপযোগী নীতিবিদ্যা, সংস্কৃতি এবং ধর্ম তাকে গড়ে নিতে হয়। জন্ম হয় উইলিয়ম জেমস-এর মতো মনস্তাত্ত্বিকের যিনি প্রমাণ করার চেষ্টা করলেন, অর্থ-লিপ্সা, যুদ্ধলিপ্সা, প্রতিযোগিতা, নিষ্ঠুরতা এবং ক্রূরতা, শঠতা এগুলো কোন বিশেষ অবস্থার ফসল নয়। এগুলো সবই হল মানুষের স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য। সুতরাং 'ব্যাটল অব অ্যাট্রিশন' অন্যায় নয়, এসব অপরিবর্তনীয় সুতরাং লেডি ম্যাকবেথ, ইয়াগো, শাইলকরা-ই সত্য। তাদের কেন্দ্র করেই শিল্প সাহিত্য নাটক আবর্তিত হচ্ছে, বাকী সব কথার কথা।...

জন্ম নিলেন ডিউ-ই-এর মত দার্শনিক, তিনি বললেন, 'সত্য মিথ্যা আবার কি? যেটা মানুষ গ্রহণ করবে সেটাই সত্য। সুতরাং মিথ্যাকে জোর দিয়ে প্রতিষ্ঠা এবং ঘোষণা করতে পারলে সেটাই সত্য। এটা একটা মানসিক অবস্থান। যেটাকে আমরা সত্য বলে গ্রহণ করি সেটাই সত্য....।' সুতরাং গোয়েবলস-এর নামে চালানো কথাটার উৎস কিন্তু প্রয়োগবাদী দার্শনিকরা। আজকাল অবশ্য অনেক মার্ক্সবাদী-ই নিজেদের প্র্যাগম্যাটিস্ট বলতে ভালোবাসেন।

মানুষের গ্রহণযোগ্য নতুন ধর্ম তাদের খোঁজ করতে হয়। এই প্রশ্নে তাদের নিজেদের দেশের প্রচলিত ধর্মমতে যদি না শানায় তো অন্য ধর্ম আমদানি করতেও তারা দ্বিধাগ্রস্ত হয় না, সর্বত্রই শুরু হয়ে যায় সুপারম্যানের খোঁজ। রাজনীতি, ধর্ম, শিল্প, সাহিত্যে, মিথ এবং সুপারম্যানকে ইতিহাসের চালিকাশক্তি বলে চিহ্নিত করা হতে থাকে।

'সংকটে'র আসল দিক থেকে দৃষ্টি ঘুরিয়ে দেবার জন্য অ-অর্থনৈতিক বিষয়গুলো কে সামনে এনে জনগণকে মোহাবিষ্ট এবং হিস্টিরিয়াগ্রস্ত করে তোলাটাই তখন তাদের রাজনৈতিক কৌশলের অংশ হয়ে যায়। একটা জাতি বা ধর্মীয় সম্প্রদায়কে সামনে পেলে ব্যাপারটা অনেক সহজ সরল হয়ে পড়ে। জাতীয় দুর্দশার কারণ হিসাবে একজন জাতীয় বীরের অভাবকেই তারা চিহ্নিত করে। ইতিহাসে জাতীয় বীর খোঁজার সংস্কৃতি চালু হয়। স্বাভাবিক ভাবে এই বীরদের যদি বর্তমানে চিহ্নিত অথবা টার্গেট হিসাবে নির্বাচিত সম্প্রদায়টার বিরুদ্ধে লড়াই-এর ইতিহাস থাকে তো আর কথাই নেই। 'শত্রুর শত্রু আমার মিত্র' এই ধারণা থেকে তাদের একদা-শত্রুকে মহান করারও চেষ্টা এখানে দোষণীয় বলে মনে করে না তারা। শুরু হয়ে যায় ইতিহাসের সাম্প্রদায়িকীকরণ। আমাদের দেশে আর এস এস, শিব সেনার দিকে তাকালেই চিত্রটা পরিষ্কার হয়ে যায়। রানা প্রতাপ, গুরু গোবিন্দ, শিবাজী প্রমুখ ভারতীয় ফ্যাসিস্তদের তৈরী জাতীয় নায়ক। এদের জাতীয় বীরদের তালিকার মধ্যে আকবর, গুরু নানক, ঝাঁসির রাণী, কুঁয়ার সিং, মঙ্গল পাণ্ডে, বেগম হজরত মহল, টিপু সুলতান, কিম্বা সূর্য সেন কেউই নেই। অর্থাৎ ভারতীয় হিন্দু ফ্যাসিবাদীদের কাছে তারাই জাতীয় বীর, যাদের মুসলমান শাসক বিরোধিতার ইতিহাস আছে, বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামের নায়করা কেউই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাদের কাছে জাতীয় বীরের সম্মান পায় না। জাতীয় বীরের হাত ধরে তারা মানুষকে অতীতের তথাকথিত গৌরবের স্বপ্নে উদ্দীপ্ত করতে চায়। হিটলার 'অতীত প্রুশিয়ান সাম্রাজ্য পুনরুত্থাপন' করার স্লোগান তুলেছিল। মুসোলিনির স্লোগান প্রাচীন রোমসাম্রাজ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা। ভারতীয় হিন্দুদের আছে 'রামরাজ্য'। মুসলমানদের 'খোদায়ী হুকুমত'।

এমন ভাবেই বর্তমানকে মোকাবিলা করার জন্য জীর্ণ পুরাতন-কে তারা দৃষ্টান্ত হিসাবে টেনে আনে। এই রকমভাবে এসে যায় এক জাতি, এক দেশ, এক ভাষা, এক ধর্ম স্লোগান (হিন্দি, হিন্দু, হিন্দুস্থান)। পরাহত হয় যুক্তিবোধ, মানবিকতা। প্রজাতিকে জাতির সংকীর্ণ সীমানায় বাঁধতে গিয়ে জাতি হয়ে দাড়ায় একটা বর্ণ এবং ধর্মের কতিপয় মানুষ। এরা প্রক্ষোভ তাড়িত হয়ে 'আমি-ই প্রথম' এই স্লোগান তুলে ধ্বংস, খুন, অপচয়ে মেতে ওঠে। সুতরাং ফ্যাসিবাদী মনস্তত্ত্বের নির্দিষ্ট লক্ষণগুলো হল: (১) অতীত গৌরবে ফিরে যাওয়ার আহ্বান (২) নিজেকে ছাড়া আর সকলকেই সন্দেহ করা (৩) যেন তেন প্রকারেণ প্রভুত্ব কায়েম করা। এর দার্শনিক ভিত: ধর্মের ভাববাদ এবং অভিজ্ঞতাবাদ। নীতিবিজ্ঞান: যেটা দিয়ে কার্যসিদ্ধি হয় সেটাই ন্যায় এবং সত্য। আভিজাত্যবাদ এবং আভিজাত্যবাদের প্রয়োগ।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

'যুগের মড়ক তাই পুনরভ্যুত্থান'

তাহলে দেখা যাচ্ছে বিত্তবানরা যখনই দুনিয়াদারির সংকটের গাড্ডায় পড়ে, আল্লারা বা ভগবানরা পৃথিবীতে উৎপাত শুরু করে দেন। পৃথিবীটাকে শান্ত করার জন্য, সুন্দর এবং মসৃণ ভাবে নিজেকে ব্যবহার করানোর অধিকারটা ছেড়ে দেন তাদের হাতে। বিত্তহীনদের সৃষ্টি করা খোদা-কে কাজে লাগানোর মধ্য দিয়ে বিত্তবান খোদা আর বিত্তহীন খোদা একাকার হয়ে যায়। শয়তান কাজ গুছিয়ে নেয়। যুগে যুগে এটাই হয়ে এসেছে, মাঝে পৃথিবীর একটা অংশ এই 'খোদা' বা 'করুণাময়'-দের উৎপাত থেকে মুক্ত ছিল। বিত্তবানরা দুনিয়া জোড়া ঐক্য গড়ে (বিভিন্ন ধর্মের) সেটাকে মুক্ত(!) করে খোদার শেকলে বেঁধে ফেলেছে... লোভ লালসা আর ভোগের হাতছানি দিয়ে 'খোদা'গুলো সেখানে আবার প্রতিষ্ঠিত। বর্তমানে কেন এই খোদার প্রয়োজন হয়ে পড়লো সেটা দেখা যাক!

এতক্ষণ ধরে আলোচনার প্রধান বক্তব্যটাই হল সাম্প্রদায়িকতা, যার উৎস ধর্ম, সেটা আসলে হল ফ্যাসিবাদের (আধুনিক) প্রস্তুতি পর্ব। একটা কথা তো প্রায়ই শোনা যায়, শাসক সম্প্রদায় যখনই বে-কায়দায় পড়ে তখনই ধর্ম এবং মহামারী তাকে বাঁচাতে এগিয়ে আসে, এগুলোকে কাজে লাগিয়েই শোষকদের একটা অংশের পরিবর্তে আর একটা অংশ রাজনৈতিক ক্ষমতাটাকে কব্জা করে। এবং নিজেদের ধর্মমত, সংস্কৃতি ও আচরণগুলোকে আইনসিদ্ধ করে। কথাটা এমনই স্বতঃসিদ্ধ যে শাসক সম্প্রদায়ভুক্ত কোনো বুদ্ধিজীবীই এর প্রতিবাদ করতে পারেন না, তাঁরা হাত পা ছুঁড়ে চিৎকার করতে থাকেন "এও এক ধরণের মৌলবাদী চিন্তা। আমাদের তো কোন সংকট নেই, ধর্ম ব্যাপারটা মানুষের বিশ্বাসের ব্যাপার—রক্ত, মাংস, সেটার লাঞ্ছনা দেখেই আমরা উদ্বিগ্ন। এর সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। এর উৎস আর্থ-সামাজিক অবস্থার মধ্যে খুঁজতে যাওয়াটা অর্থহীন। এটা মার্ক্সবাদীদের জেনোফোভিয়া!" ইত্যাদি ইত্যাদি ধানাই পানাই...। তাঁদের খুব সরল সিধে একটা প্রশ্ন করা যেতে পারে কেন হঠাৎ হঠাৎ আপনাদের ধর্মকে চাগিয়ে তুলতে হয়? এক-একটা বিশেষ ধর্মের জন্য কেন আপনারা হঠাৎ হঠাৎ এমন ক্ষেপে ওঠেন? এমনিতে তো আপনারা কেউ-ই ধর্মীয় আচারের ধারে কাছে থাকেন না। পণ্য আপনাদের ভগবান, ভোগ আপনাদের শেষ কথা। পোলান্ডের ওয়ালেসা, কিম্বা বুখারেস্টের পাদ্রী, আর্মেনিয়ার মৌলভি কিম্বা ভারতের অশোক সিংঘল, আদবানি কেউ-ই এই প্রশ্নের উত্তর দেন না।

অতীতের ধর্মীয় পুনরুত্থানের সঙ্গে এবারের একটা মৌলিক পার্থক্য আছে। ইতিপূর্বে সাম্প্রদায়িক শক্তির উত্থান ঘটেছে এক একটা বিশেষ অঞ্চল জুড়ে। বিশেষ করে সেই সমস্ত অঞ্চলে যেখানে পণ্য উৎপাদন ব্যবস্থা একটা সম্পূর্ণতা লাভ করেনি। অর্থনৈতিক পরিভাষায় যাকে বলে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা কায়েম হয় নি সেই সমস্ত দেশে।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই শতাব্দীর দুই-এর দশকেই ফ্যাসিবাদ এবং নাৎসিবাদ সরাসরি ধর্ম এবং ধর্মীয় সম্প্রদায়কে একটা আন্তর্জাতিক রূপ দেবার চেষ্টা করে। এবং বিভিন্ন দেশে সেটা 'বর্ণবাদ' এবং 'জাত্যভিমানে'র আড়ালে আত্মপ্রকাশ করে। কিন্তু সেই সংগঠনটার কেন্দ্রীভূত রূপটা দুর্বল থাকার জন্য দু-একটা দেশেই সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। কিন্তু এই যুগের পুনরুত্থানবাদ এসেছে একটা ব্যবস্থা হিসাবে। পৃথিবীর দেশে দেশে বর্ণবাদী, জাত্যভিমানী এবং ধর্মীয় মৌলবাদীরা রাষ্ট্রক্ষমতার কর্তৃত্বে থাকার জন্য এটা একটা ব্যবস্থাপনায় রূপান্তরিত।

প্রায় একই সঙ্গে পৃথিবীর সব রকম আর্থ সামাজিক ব্যবস্থার দেশেই এর অভ্যুত্থান ঘটেছে। তা সে রাশিয়া, আমেরিকা, রুমানিয়া, পোলাণ্ডই হোক আর ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশই হোক। সব ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে একই কায়দা। স্লোগানও এক—"গণতন্ত্র, স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করো, সমাজতন্ত্রকে ধ্বংস করো!"

একটু নজর রাখলেই বোঝা যায় এদের আন্তর্জাতিক চরিত্র। যে দিন চার্চের ঘণ্টা বাজিয়ে বুখারেস্টের রাস্তায় লেনিনের মূর্তি ভাঙা হলো—সেদিনই কলকাতার বুকে দেওয়াল লিখন "লেনিন সরনী" নাম তুলে দিতে হবে। ব্যাপারটা কাকতালীয় নয়। এক কথায় বলা যায়—সামাজিক প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলো একটা 'আন্তর্জাতিক' ঐক্য গড়ে তুলে সংগ্রামে নেমেছে—সামাজিক শুভ শক্তির বিরুদ্ধে।

কবে থেকে তারা এই সংগঠন গড়ে তুললো? এর কি কোন নথি তারা রেখেছে? হ্যাঁ। ভিয়েতনামোত্তর যুদ্ধ-পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে আমেরিকার জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদ বিশ্বকে কব্জায় রাখার জন্য কতগুলো নির্দেশ দেয়। তার মধ্যে একটা হলো—"নিজের প্রভাবাধীন এলাকা বজায় রাখার জন্য অন্যের প্রভাবাধীন এলাকায় অনুপ্রবেশের জন্য.....ধর্ম, গণতন্ত্র, স্বাধীনতা এবং জাতীয় সংস্কৃতিগুলো ব্যবহার করে সেই সমস্ত এলাকার মানুষকে শর্তাধীন করে তুলতে হবে। (কাণ্ডিশন্‌ড)" (৬৮ নং ধারা)।

AMARBOI.COM

আটের দশকের এই নির্দেশের ফলেই আমরা দেখলাম—বার বার কয়েকটা "ধর্মীয় মহাসম্মেলন।" আমেরিকাতে-এর শুরু, আপাতত রাশিয়ায় শেষ। আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের প্রত্যক্ষ মদতে দেশে দেশে গড়ে উঠলো ক্ল্যানগেস্টাইন সংগঠন, ধর্মের নামে। তাদের সমর্থন করার জন্য রাজনৈতিক দল। অর্থাৎ একপ্রস্থ রণনীতি এবং রণকৌশল নিয়ে বিশ্ব-প্রতিক্রিয়া নিজেদের জঘন্য উদ্দেশ্য সাধনের জন্য (বিশ্ব-প্রভুত্ব) জনগণের বিশ্বাসকে ভাঙালো। অবশ্যই এ-কাজ তারা করতে পারলো কারণ বিশ্ব-সমাজতান্ত্রিক শিবিরের ধ্বংস তাদের পথ পরিষ্কার করেই রেখেছিল। তার ওপর দেশে দেশে "গণতন্ত্রী"দের দুর্নীতি, অপশাসন মানুষকে বিক্ষোভের দোরগোড়ায় এনে ফেলেছে।

এখন প্রশ্ন কেন আমেরিকাকে এই পদক্ষেপ নিতে হচ্ছে? এর সঙ্গে যুক্ত বর্তমান বিশ্বের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা।

পৃথিবীর সবচেয়ে বড় মহাজন আজ একনম্বর খাতক

আমেরিকান অর্থনীতিবিদ রবি বাটরা "১৯৯০ এর মহামন্দা" বলে একটা বই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লেখেন। তাতে তিনি দেখিয়েছেন, ৯০-৯৭ সালের মধ্যে পুঁজিবাদী অর্থনীতি তার বৃহত্তম সংকটের মধ্যে পড়বে। অনেক বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদ বর্তমানের উপসাগরীয় সংকটকে তারই সূচনা বলে মনে করছেন। রবির মূল্যায়নের মূল সূত্র হলো বর্তমান বিশ্বের বাজার সংকট। "চাহিদা" কমে যাচ্ছে দ্রুত। ফলে পৃথিবীর সমস্ত রাষ্ট্রগুলোই কম বেশি সংকটে পড়েছে। সবচেয়ে বেশি সংকটাপন্ন অবস্থা আমেরিকার।

সেই সাতের দশক থেকেই "উন্নত দেশগুলো," "লেবর-ইনসেনটিভ" যুক্ত মূল শিল্পগুলো উন্নয়নকামী দেশগুলোর ঘাড়ে চাপিয়ে আসছে। কারণ "উন্নত দেশ"গুলোতে শ্রমিকদের জীবনযাত্রার মান বজায় রাখতে অনেক বেশি পারিশ্রমিক তাদের দিতে হয়। সামাজিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখার জন্য এই সমস্ত দেশের সরকারগুলোকেও শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধির ব্যাপারে তীক্ষ্ণ নজর রাখতে হয়। এই যে শিল্প ঘাড় থেকে নামিয়ে গরিব দেশগুলোর ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া হলো এর ফল কি হচ্ছে? প্রতিবছর ১০ কোটি শিশু অনাহারে থাকছে, ৪০ হাজার লোক না খেতে পেয়ে মারা যাচ্ছে।

মার্কস একবার বলেছিলেন, "পুঁজিবাদী বিজ্ঞান এবং কারিগরি ব্যবস্থা যত উন্নত হবে, শ্রমিক শ্রেণী ততই বেশি করে একেবারে দারিদ্র্যের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হবে," অনেক বোদ্ধা মার্ক্সের এই কথাটাকে ব্যঙ্গ করে বলেন—"ব্লু কলার শ্রমিক কমবে কিন্তু হোয়াইট কলার শ্রমিক বাড়বে।" এটা সত্যি হলেও আসল প্রশ্নটা তাঁরা এড়িয়ে যান। কেন উন্নত দেশগুলোতে ব্লু-কলার শ্রমিক (ঘেমো-শ্রমিক) কমছে। এবং কাদের বিনিময়ে। উত্তর পেতে হবে আফ্রিকা, এশিয়া আর লাতিন আমেরিকার অভুক্ত শিশুগুলোর মুখের দিকে তাকিয়ে।

এক কথায় গোটা দুনিয়াটা আজ গরিব দেশ আর ধনী দেশে বিভক্ত। ধনী দেশগুলোর বহুজাতিক সংস্থা এবং ঋণ দেবার অর্থনীতির চাপে বাকি সমস্ত দেশ দেউলিয়া। এর ফলে দেশগুলোর সমস্ত সমৃদ্ধি জলের মত বেরিয়ে যাচ্ছে।

জাতিপুঞ্জের একটা সমীক্ষা থেকে জানা যাচ্ছে—আসলে গরিব দেশগুলোই ধনী দেশে টাকা ঢালছে। প্রতি বছর ৫০ বিলিয়ন আমেরিকান ডলার সুদ হিসাবে এই সমস্ত দেশগুলো থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে। ভারত এবং ব্রেজিল প্রভৃতি কতগুলো দেশ প্রথমে ভেবেছিল ঋণের টাকা দিয়ে উৎপাদন বাড়িয়ে সুদ সমেত কিছু শোধ করবে। কিন্তু বাস্তবে দেখা যাচ্ছে ধনী দেশগুলোর শুল্ক নীতি ইত্যাদি আইনের ফলে ঋণের বোঝা বেড়েই যাচ্ছে। আশিটারও বেশী দেশ বিশাল ঋণের বোঝা ঘাড়ে নিয়ে ধুঁকছে। চল্লিশটা দেশ তাদের ঋণ শোধ করতেই পারছে না। সতেরটা দেশের জাতীয় অর্থনীতি ধ্বংসের কিনারায়।

এর প্রভাব পড়ছে ধনী-দেশগুলোর ওপর। প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও এই সমস্ত দেশ রপ্তানির ক্ষেত্রে সংকোচনের নীতি আরোপ করতে বাধ্য হচ্ছে। পশ্চিম ইওরোপের দেশগুলো একটা ফেডারেল স্টেট গড়ে-এর মোকাবিলা করতে চাইছে। আমেরিকা পড়েছে মহা সংকটে। আজ আমেরিকার ঋণ পাঁচশো বিলিয়ন আমেরিকান ডলার। অবশ্যই আমেরিকার ঋণগ্রস্ত হবার কারণ ভিন্ন। কিন্তু আসল কথাটা হলো—পৃথিবীর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মহাজন আজ পৃথিবীর দরবারে এক নম্বর খাতক।

গোটা পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা আজ সংকটের আবর্তে।

রাজনৈতিক অবস্থা

যখনই পুঁজিবাদ অর্থনৈতিক সংকটের এই চোরা ঘূর্ণিতে পড়ে, পুঁজিবাদ রাজনৈতিক বিন্যাসের মাধ্যমে তার সমাধান খোঁজে। ১৯২৮-৩০ সালে বিশ্ব পুঁজিবাদী অর্থনীতির এই রকম অবস্থা দেখেই স্তালিন পুঁজিবাদের সার্বিক সংকটের কথা ঘোষণা করেছিলেন। কার্যত সেই সংকট আমরা দেখেছি ১৯২৯-৩৬এ। একদিকে কেইনসীয় তত্ত্ব অবলম্বন করে অন্যদিকে রাজনৈতিক শক্তির পুনর্বিন্যাস ঘটিয়ে সে দিন তারা রক্ষা পেয়েছিল। ফলশ্রুতিতে নেমে এসেছিল ফ্যাসীবাদ এবং নাৎসীবাদ।

খুব সংক্ষেপে বলতে গেলে বলতে হবে আজকের বিশ্ব-অর্থনীতি প্রাক্ বিশ্বযুদ্ধ কালীন অবস্থার সঙ্গে হুবহু মিলে যাচ্ছে। ধনী দেশগুলোর সামনে বিশ্বটাকে ভাগ-বাঁটওয়ারা করে নেবার জন্য পাঞ্জা কষতে নামা ছাড়া গতি নেই। এখন চলেছে ফ্রন্ট গঠনের সময়। আমেরিকা পৃথিবীর দেশে দেশে সেই সমস্ত শক্তিগুলোকে শাসন-ক্ষমতায় দেখতে চায় যারা নিজের দেশের গলায় একটার পর একটা ফাঁস পরে তার রপ্তানির বাজারটা নিরবিচ্ছিন্ন রাখবে এবং সমস্ত মানবিক মূল্যবোধকে বিসর্জন দিয়ে দেশের মানুষের ওপর দিয়ে পেষাই যন্ত্রটা চালাতে পারবে। প্রতিটি ফ্রন্ট, প্রতিটি বিবেককে রুদ্ধ করতে পারবে। তারই জন্য আমেরিকানদের ধর্মীয় সংগঠন এবং রাজনৈতিক দলের পেছনে এই বিনিয়োগ। এই বিনিয়োগ আজ সংকেতিত ভাবে প্রমাণিত। কি করে সে পারবে ঘরে বাইরে এই অবস্থা সামাল দিতে? [প্রসঙ্গত উল্লেখ্য "যুদ্ধখাতে কোন ট্যাক্স নয়" এই আন্দোলন খোদ আমেরিকার বুকে প্রতিদিন জোরদার হচ্ছে। ট্যাক্সদাতারা যুদ্ধ খাতের ট্যাক্সটা একটা ব্যাঙ্কে জমা রাখছেন বিশ্ব শান্তি আন্দোলনের জন্য।] ইতালীতে মুসোলিনি যে রকমভাবে পেরেছিল, আমেরিকার নির্দেশ সেই কায়দায় বিভিন্ন দেশে তাদের মদতপুষ্ট লোকেরা ক্ষমতায় আসুক। মুসোলিনির পার্টি মিনিটস্ আজ তাই এদের বাইবেল।

আগেই বলেছি। মুসোলিনি ক্ষমতায় আসার প্রাক্কালে নিজের ফ্যাসিস্ট পার্টির সদস্যদের মিটিঙে কি বলছে। পার্টি ভোট পেয়েছে ১৩%। মুসোলিনী বলছে—"প্রশ্ন উঠেছে কে ইতালী শাসন করবে? আমি বলছি আমরা?" শতকরা ১৩ জন লোকের সমর্থন নিয়ে কি করে সে দেশের কর্তৃত্ব পেতে চায়? কি তার পরিকল্পনা?

".....গণতন্ত্রীরা এমনিতেই যথেষ্ট দুর্নীতিগ্রস্ত হয়ে পড়েছে, আমরা তাদের আরও দুর্নীতিগ্রস্ত করে তুলবো। কিছু কিছু ক্যাথলিক পকেটে ক্যাথলিকদের মদত দিয়ে প্রোটেস্ট্যান্টদের সাথে দাঙ্গায় লিপ্ত করাবো"। এই কাজে "জাতীয় উত্তরাধিকার" "জাতীয় ঐতিহ্য" বিপন্ন এই বিষয়গুলোকে সে কাজে লাগিয়েছিল। ইতিহাসের ছাত্র মাত্রই জানেন, মুসোলিনির এই জাতীয়তাবাদ ছিল আসলে ফ্যাসীবাদের পক্ষে জনমানস তৈরি করা। আমেরিকা আজ পৃথিবীর দেশে দেশে একই কায়দায় নয়া-ফ্যাসীবাদী অভ্যুত্থান

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঘটাতে সচেষ্ট। এবং বলা বাহুল্য সে কিছুটা পরিমাণে সাফল্যও পেয়েছে। ফ্যাসী-বিরোধী সমস্ত স্মারক ভেঙেই তার এই অভিযান শুরু। তা সে স্মারক একটা এপিটাফই হোক, কিম্বা একজন ব্যক্তিই হোন। ইতিহাস, বিজ্ঞান প্রভৃতি সবগুলো হাতিয়ারকেই সে কাজে লাগাচ্ছে। তাই আজকের দিনে সাম্প্রদায়িকতা কেবলমাত্র একটা আঞ্চলিক বা তাৎক্ষণিক সংজ্ঞা নয়—এটা সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলোর বিশ্বকে ভাগাভাগি করে নেবার যে বিশ্ব-রণনীতি তারই অংশ। দেশে দেশে ফ্যাসিস্ত শক্তিগুলো ক্ষমতায় আসীন হলে, সাম্রাজ্যবাদ সামরিক ব্যয় বহন না করেও সে দেশকে পুঁজির অবাধ মৃগয়াতে পরিণত করতে পারবে। ফ্যাসীবাদকেও তারা গণতন্ত্রীকরণ করিয়ে নিতে চায়। তাই ধর্মের আবরণে, জাতীয়-সংস্কৃতির পোশাকে সেগুলোকে দুর্দশাগ্রস্ত মানুষের সামনে হাজির করে। হতাশ, বিপন্ন মানুষ সেই টোপ গেলেন। তারপর ভোট করিয়ে গণতান্ত্রিক উপায়েই ফ্যাসিস্ত শক্তি ক্ষমতায় আসে। সে দিক থেকে বলা যায় রেনেসাঁ যেমন ছিল আধুনিক পুঁজিবাদীদের আগমনী, দেশে দেশে এই ধর্মীয় পুনরুত্থানবাদের উৎপাত নয়া ফ্যাসিবাদের পদধ্বনি। ফ্যাসিস্ত শক্তির পক্ষে জন-মানস তৈরির প্রতি-বিপ্লবী পদক্ষেপ। প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির শাসনক্ষমতায় একচেটিয়া আসার জন্য সাংস্কৃতিক হামলা। তাই সাম্প্রদায়িকতা হলো—সাংস্কৃতিক সন্ত্রাসবাদ। এদিক দিয়ে দেখলে, ফ্যাসিবাদের 'বাম' আবরণের নীচে প্রভুত্ব বিস্তার করার কৌশলও দেখা যায়। তাই, ফ্যাসিবাদ আজ ডান-বাম দু'দিক দিয়েই আসছে।

মোকাবিলার উপায়

যেহেতু এটার আক্রমণ মানুষের সংস্কৃতির জগতে, তাই কেবলমাত্র ভোটে পরাজিত করেই এদের ঠেকানো যাবে না। সাময়িক হয়তো তাদের ক্ষমতা থেকে দূরে রাখা যায় কিন্তু রোধ করা যায় না। তিরিশের দশকের ফ্যাসীবাদী অভ্যুত্থানের সঙ্গে এবারের কতগুলো নির্দিষ্ট পার্থক্য আছে:—

(১) সেই যুগে আন্তর্জাতিক ফ্যাসীবাদকে রোখার জন্য জনগণেরও একটা আন্তর্জাতিক সংগঠন ছিল। সেটা না থাকার সুবিধাটা তারা পেয়ে গেছে।

অন্যদিকে:—আজ সমগ্র বিশ্বে ফ্যাসীবিরোধী ব্যক্তির সংখ্যা কিন্তু অনেক বেশি, কিন্তু অসংগঠিত।

যে কারণে পাঁচজন ডাকাত এক কম্পার্টমেন্ট ভর্তি লোককে ডাকাতি করে সর্বস্বান্ত করতে পারে, সেই কারণেই এই কজন লোক বিশ্বের ব্যাপক মানুষকে সর্বস্বান্ত করতে পারছে। কম্পার্টমেন্টের দুশোজন যাত্রী—কিন্তু দুশো জন-ই এক একজন ব্যক্তি মাত্র। ডাকাতরা সেখানে পাঁচ জন। সুতরাং লড়াইটা হয় আসলে পাঁচ জন ডাকাতের সঙ্গে একজন যাত্রীর। তাই তারা পারে ডাকাতি করতে। এরই জন্য ভোটের শতকরা হিসাবে এই সামাজিক এবং রাজনৈতিক ডাকাতদের শক্তির হিসাব নিকেশ করতে যাওয়াটা ভুল হবে। মনে রাখতে হবে—এরা সংগঠিত, রেজিমেন্টেড, আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়ার সমর্থনপুষ্ট। এদের আক্রমণ দুদিক থেকেই। ডান এবং বাম। দু-রকমভাবে এদের মোকাবিলা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করা যেতে পারে। এক, ঘাড়ের ওপর যখন এসে পড়ছে ওদের কায়দাতেই ওদের জঙ্গীপনার মোকাবিলা করে জানিয়ে দেওয়া, দাঙ্গাবাজদের কালো হাত গুঁড়িয়ে দিতে আমরাও প্রস্তুত। দুই, দীর্ঘস্থায়ী পরিকল্পনা নিয়ে সংস্কৃতির জগৎ থেকে ওদের বিচ্ছিন্ন করা। ধর্ম, জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, জাতীয় উত্তরাধিকার, প্রভৃতি মোহ থেকে জনগণকে মুক্ত করা।

ফ্যাসিস্ত দর্শনের মূল কথা:—"ডাউট্ অল্" "সকলকে সন্দেহ করো"। মানুষে মানুষে অবিশ্বাস সৃষ্টি করেই তারা তাদের কাজ হাসিল করে থাকে। মানুষের স্বাভাবিক সংস্কৃতি "শ্রদ্ধা-সহযোগিতা" ভিত্তিক। ফ্যাসিস্তরা এগুলোকে ভেঙে দেয় পুঁজির স্বার্থে। শোষণের স্বার্থে। সুতরাং অর্থনৈতিক মুক্তির জন্যও মানুষের এই ঐক্য গড়ে তোলার কাজকে হেয় করা যায় না।

একথা যেমন সত্য, শ্রেণী সংগ্রামের বিকাশ ফ্যাসিস্ত শক্তির অগ্রগতি রুদ্ধ করবে; আবার এটাও সমান সত্যি, ফ্যাসিস্ত দর্শন এবং সংস্কৃতির প্রভাবকে দমন না করতে পারলে শ্রেণী সংগ্রামের বিকাশ ঘটানোও মুশকিল।

ঐক্যবদ্ধ হওয়া যায় এমন সমস্ত শক্তির সঙ্গে ব্যাপক ঐক্যবদ্ধ ফ্রন্টই পারে মানুষের সংস্কৃতির জগতে ধর্মের আবরণে বা বামবুলির আড়ালে ফ্যাসিবাদী এই আক্রমণ রুখতে।

সব মৌলবাদীই এক এবং অভিন্ন। বালথ্যাকারে আর মওলানা মওদুদির মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। আজম এবং আদবানি এক। 'বিশ্ব হিন্দু-পরিষদ' এবং 'জামায়েত' অভিন্ন। এরা একাত্মা, এক দেহে লীন। কারণ, তাদের মৌলিক দর্শন, কর্মপদ্ধতি এবং শেষ লক্ষ্য এক এবং অভিন্ন।

উভয় সম্প্রদায়ের মৌলবাদীদের মৌলিক দাবী হলো, 'শর্তহীন আনুগত্য।' এই আনুগত্যের অভাবই মানুষের প্রথম 'পাপ'; সুতরাং প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা অন্যায়। অন্যায় এবং অবিচারের ওপর প্রতিষ্ঠিত সামাজিক ব্যবস্থাটাকেই এরা 'ন্যায়', 'চিরায়ত' এবং 'শাশ্বত' বলে চালাবার চেষ্টা করে থাকে। ফলত এদের শেষ লক্ষ্য হলো এমন একটা সমাজ ব্যবস্থার পক্ষে জনমত গড়ে তোলা যেখানে প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রশক্তিকে কোনো প্রশ্ন করা যাবে না এবং তাদের প্রতি থাকবে শর্তহীন আনুগত্য, তাই রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে তারা নাৎসিবাদ এবং ফ্যাসিবাদকে পরম গ্রহণযোগ্য বলে মনে করে। এই কারণেই বালথ্যাকারে এবং মওলানা মওদুদি একই ভাষায় হিটলার আর মুসোলিনীর প্রশস্তি গায়। এবং একই রকমভাবে সমাজতন্ত্র-বিরোধী।

এক কথায় বললে বলতেই হবে, ধর্মীয় মৌলবাদের জন্ম ও বিকাশ সমাজের মৌলিক দ্বন্দ্বগুলোকে বিকশিত না করতে দেবার জন্য। ভলতেয়ার যে কথা বলেছিলেন, 'আমরা জানি ভগবান নেই। কিন্তু জনগণের ভগবানের প্রয়োজন আছে।' অর্থাৎ আমাদের জন্য জনগণের মধ্যে প্রয়োজনীয়তাটাকে তৈরি করা এবং বিকাশ করার প্রয়োজন আছে। (ব্যাখ্যা—আমার)। এই প্রশ্নে মনু, হদিশ, হিটলার কিম্বা বালথ্যাকারে, মৌলানা মওদুদি, হিটলার মিলেমিশে গেছে।

অতএব ধর্মীয় মৌলবাদ হচ্ছে আসলে একটা আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা কায়েমের সাংস্কৃতিক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কর্মসূচী। তার সংগ্রামের বর্শা-ফলকটা থাকে মানুষের বিরুদ্ধে, তার লক্ষ্য—শেষ বিচারে রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল। সাম্প্রদায়িকতাটি সেখানে একটা উপায় মাত্র। সাম্প্রদায়িকতার ওপর যে নির্ভর করবেই ব্যাপারটা, সেরকম নাও হতে পারে।

সাম্প্রদায়িকতা হলো একই শ্রেণী-কাঠামোর মধ্যে দুই বা ততোধিক ধর্ম সম্প্রদায়ের সুবিধা আদায়ের দরকষাকষির জন্য ধর্মের ব্যবহার। এটার পরিবর্তন হতে পারে। যেমন বদরুদ্দিন উমর দেখিয়েছেন, '৪৭ সালের পরে পাকিস্তান হবার পরে, হিন্দুদের জায়গায় মুসলমানরাই সব কিছু দখল করে নেয়। ফলে মুসলমান শাসক, শোষক এবং মুসলমান শোষিতদের মধ্যে সমাজ বিভক্ত হয়ে পড়ে। যেটা আবার '৭১ সালে বাঙালি মুসলমান অবাঙালি মুসলমানের দ্বন্দ্ব হিসাবে সামনে আসে। বর্তমানে সেখানে ধর্মের ব্যবহার হচ্ছে সরাসরি গণতান্ত্রিক আন্দোলনের বিরুদ্ধে। কারণ, এখন আর হিন্দুদের কিম্বা অবাঙালিকে দেখানো যাচ্ছে না। অর্থাৎ, শেষবিচারে ধর্মীয় মৌলবাদ তার নখ আর দাঁত বের করে ঝাঁপিয়ে পড়ে সাধারণ মানুষের জান-মালের ওপর। তাই মৌলবাদীরা এক এবং অভিন্ন। কেমনভাবে সেটা এবার দেখা যাক!

মতাদর্শের রূপ

"..... মার্ক্সবাদীরা সকলকে উদ্ধার করতে চায়, কিন্তু তারা জানে না, ঐ ইহুদী জাতটাকে উদ্ধার করা শিবেরও অসাধ্য কাজ। ইতিহাসের এক পর্যায় পর্যন্ত আমি ইহুদীদের কার্যকলাপ অনুসন্ধান করে উদ্বিগ্ন"। (হিটলারের আত্মজীবনী থেকে)

'.....(মুসলমানদের কাজকর্ম দেখে ২১ সালের পর) ডাক্তারজি (হেড্‌গেওয়ার) অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে ওঠেন। বিশেষ করে মুসলমানদের বাড়াবাড়ি এবং বেইমানি দেখে, মপলাদের (এখানে মপলাকৃষক-বিদ্রোহের কথা বলা হয়েছে, অর্থাৎ মপলা-বিদ্রোহ ঠেকাতেই আর-এস-এসের জন্ম) বাড়াবাড়ি। তারপরে তিনি সিদ্ধান্ত নেন কেবলমাত্র হিন্দুরাই পারেন'।

[আর-এস-এস-এর বিকাশ সম্পর্কে ঐ দলের প্রচারিত পুস্তিকা থেকে]

'..... আমাদের প্রিয় নবীই দুনিয়ার মানুষেরা সেরা নেতা, তাঁর পথই শ্রেষ্ঠ পথ, যাহারা সেই পথ গ্রহণ করে না তাহারা কাফের..... কাফের কখনও ভাল হয় না কারণ তাহারা সত্য বলে না।

[ইসলাম প্রচার সমিতি]

মন্তব্য: হিটলারের ইহুদী, আর-এস-এস-এর মুসলমান, জামায়েত-এর কাফের—সকলেই মনুষ্যেতর জীব! হিটলার ইহুদী নিধন শুরু করেছিল একটা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য মাথায় রেখেই। এরাও সেটিই করতে চায়।

মার্কসবাদ ও গণতন্ত্র সম্পর্কে

'..... মার্ক্সবাদ অর্থাৎ ইহুদীদের মতবাদ, প্রকৃতির আভিজাত্য তত্ত্ব অস্বীকার করে। তারা বলে শক্তির কথা, সংখ্যাধিক্যের ওপর তারা বিশ্বাস করে এবং জনগণ নামক

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একটা মৃতের বোঝা আমাদের ওপর চাপিয়ে দিতে চায়। তারা জাতিকে ব্যক্তির ওপর এবং প্রজাতিকে জাতির ওপরে স্থান দেয়। এটা যদি মানুষ গ্রহণ করে তাহলে সার্বিক বিশৃঙ্খলা দেখা দেবে। ইহুদীরা যদি মার্ক্সবাদীদের সাহায্যে ক্ষমতায় আসে (অর্থাৎ মার্ক্সবাদীরা) সেটা হবে মানব-জাতির চরম সর্বনাশ.....'

[মেইন ক্যাম্ফ]

'মার্ক্সবাদীরা অ-হিন্দু কারণ তাদের উৎস বিদেশী। এখানে থাকতে হলে অ-হিন্দুদের সমস্ত সুযোগ সুবিধা ভোগের এমন কি নাগরিকত্বের পশ্চিমী গণতন্ত্র এবং জাতির ধারণা ত্যাগ করতে হবে' (গোলওয়ালকার, আমাদের জাতি)।

'সমাজতন্ত্রের পতন হয়েছে, ফাঁকটা হিন্দুত্ব দিয়ে ভরাতে হবে।' [ঐ]

'যে ধরনের শাসনতন্ত্রে নাগরিকদের নিরঙ্কুশ প্রভুত্বের অধিকার স্বীকৃত রাজনৈতিক পরিভাষায় তাকেই গণতন্ত্র বলে, ইসলামে এবং ইস্‌লামিক রাষ্ট্রনীতিতে তার কোনো স্থান নেই।

[ইসলামের রাজনৈতিক মতবাদ, ইসলাম প্রচার সমিতি কর্তৃক প্রকাশিত]

'মার্ক্সবাদের কবরের ওপরেই ইসলামের বিজয় ধ্বজা উড়বে' [ঐ]

মন্তব্য: সাদৃশ্য পরিষ্কার। লক্ষ্য এক, পথ-ও-এক।

গণহত্যার যুক্তি

'..... আমি মনে করি, আজ আমি যা করছি (ইহুদী নিধন) তা ঠিক করছি। সর্বশক্তিমান স্রষ্টার ইচ্ছানুসারেই করছি। ইহুদীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করে আমি ভগবানের সৃষ্টিকেই রক্ষা করছি।

'পাঁচশ জনের (সাংসদ) মতামত নিয়ে দেশ শাসন করতে গিয়ে সরকার নিজেকে ইতরের স্তরে নামিয়ে এনেছিল [হিটলার: আত্মজীবনী]

'বাবরি মসজিদ প্রশ্নটা যুক্তির নয়, বিশ্বাসের। রামজির ইচ্ছাতেই ওটা ধ্বংস হয়েছে। [কল্যাণ সিং, বি-জে-পি]

'এখানে থাকতে গেলে তাদের (মুসলমানদের) হিন্দুদের অধীনস্থ থাকতে হবে, এমন কি নাগরিকত্বের অধিকারও চাওয়া চলবে না।' [গোলওয়ালকার]

'কাফের হত্যার মধ্যে পাপ নেই, পরম করুণাময় খোদার সেটা ইচ্ছা।'

[মওলানা সইদা, বাঙলাদেশ]

মন্তব্য: মানুষ খুন করে মানুষের মধ্যে নিরাপত্তাহীনতা জাগিয়ে তোলা হয়। সেই ফাঁকে চলে রাজনৈতিক ক্ষমতাটা করায়ত্ত করা। হিটলার যেটাকে বলেছে, ফিজিক্যাল অ্যাণ্ড মেন্টাল টেরর ইজ-দ্য কী টু বিল্ড অ্যান অরগানাইজেশন।

হিটলার সম্পর্কে হিন্দু-মুসলমান নেতারা

'হিটলার হচ্ছে আমাদের যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ দেশপ্রেমিক।'

[বালথ্যাকারে]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'একটা জাতি এবং সংস্কৃতির বিশুদ্ধতা রক্ষার জন্য হিটলার যখন সেমিটিক রক্তের জাতি ইহুদী বিতাড়ন শুরু করে, সমগ্র বিশ্ব তখন হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু মনে রাখতে হবে তার ফলেই সেই সময়ে জার্মানির জাতীয় গৌরব সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছয়। জার্মানি আমাদের শিক্ষা দিয়েছে, দুটো পরস্পর-বিরোধী রক্তজাত এবং সম্পূর্ণ বিপরীত সংস্কৃতির মধ্যে পার্থক্যটা মৌলিক। (উৎসেই ফারাক)। তাদের কোনো সময়েই একাত্ম হওয়া সম্ভব নয়। হিন্দুস্থানে আমাদের সেই ঘটনা থেকে শিক্ষা নিতে হবে, এই কর্মকৌশল থেকে ফায়দা ওঠাতে হবে।' [গোলওয়ালকার, আমাদের জাতি]

'দুনিয়ার এই সমস্ত চালাক জাতিগুলোর (জার্মান, ইতালি) কাছে থেকে আমাদের শিক্ষা নিতে হবে। এবং তাদের এই মতই আমাদের অনুমোদন করতে হবে যে—ভারতবর্ষে যে সমস্ত অ-হিন্দু আছে তাদের অবশ্যই হিন্দু কৃষ্টি এবং ভাষা গ্রহণ করতে হবে [ঐ]

মুসলিম নেতারা

যে সমস্ত দল একটা শক্তিশালী আদর্শ এবং চমৎকার দর্শনের ভিত্তিতে গড়ে ওঠে, সব সময়েই তাদের সদস্য সংখ্যা অল্প থাকে। মুসোলিনির পার্টির সদস্য সংখ্যা ছিল মাত্র চার লাখ, রোমের সড়ক বরাবর তারা যখন অভিযান চালায় তাতে অংশগ্রহণ করে মাত্র তিন লাখ সদস্য। এই তিন লাখ লোকই সাড়ে চার কোটি লোককে কয়েক মাসেই পদানত করে ফেলে।

[তারজুমার আল্ কোরান পত্রিকাতে '৭৫ সাল আগস্ট সংখ্যায় জামায়েত নেতা মওলানা মওদুদি]

AMARBOI.COM

সার-সংকলন

তা হলে যেটা পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠছে তা হলো, সব ধর্মীয় মৌলবাদীই আসলে মসনদবাদী। রাষ্ট্র-ক্ষমতাটা কুক্ষিগত করাটাই তাদের আসল উদ্দেশ্য, ধর্ম সেখানে একটা উপায় মাত্র। মানুষের হতাশা, আস্থার অভাব (যাঁদের ওপর ভরসা ছিল তাঁদের পদস্খলন বা দুর্নীতিপূর্ণ কাজকর্মে), দুর্দশা এবং অনিশ্চিত ভবিষ্যতের ওপর পুঁজি করে এরা ধর্মকে ব্যবহার করছে মানুষকে বিশেষ উদ্দেশ্যে শর্তাধীন করে তোলার জন্য। অর্থাৎ, রাষ্ট্র-ক্ষমতাটা দখলের জন্য জনমানস তৈরি করাই লক্ষ্য। এ-ক্ষেত্রে তাদের আদর্শ হিটলারের কিংবা মুসোলিনির নেতৃত্বে পরিচালিত জার্মান এবং ইতালি।

কারণ: (১) হিটলার এবং ধর্মীয় মৌলবাদীরা একই রকমভাবে সাধারণ মানুষকে ঘৃণা করে। হিটলারের কাছে তারা 'মৃতের বোঝা, শুধুই খায়।' গোলওয়ালকার মনে করে, 'জনগণ মানে হুকুম তামিলের যন্ত্র' (আমাদের জাতি), মওদুদির ভাষায়, 'তারা পানি নয়, নর্দমার পাঁক!' তাই হিটলার চাইতো, 'অভিজাতের শাসন', গোলওয়াকার ব্রহ্মাণ্য সমাজ,' আর মওদুদি চায় 'আমিরদের'।

(২) তিনজনই 'সাংস্কৃতিক সন্ত্রাসবাদ' সৃষ্টি করে মানুষের মধ্যে নিরাপত্তাহীনতা জাগিয়ে তাদের পক্ষে আনতে চায়। হিটলার মনে করতো, 'সমৃদ্ধ এবং প্রভাবশালী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইহুদী সংস্কৃতিকে ধ্বংস না করে বিকাশ সম্ভব নয়। গোলওয়ালকার অ-হিন্দু সংস্কৃতির 'ক্ষতিকারক প্রভাব' রোধ করতে বদ্ধপরিকর। মওদুদি ভাবে, 'অ-মুসলমান সব কিছুই অসত্য'। কারণ সেটা পয়গম্বরের অনুমোদিত নয়।

(৩) ফলে, এরা প্রত্যেকেই বিরোধী সংস্কৃতির প্রসার এবং প্রভাব সম্পর্কে আতঙ্কিত।

(৪) এই কারণে এরা প্রত্যেকেই নিজেদের ক্ষমতাকে সবদিক থেকে নিষ্কণ্টক করার জন্য 'ব্যাটল অব অ্যাট্রিশন' বা বিরোধী সংস্কৃতিকে নির্মূল করার নীতিতে বিশ্বাসী।

(৫) এরা প্রত্যেকেই কমিউনিজমের চরম শত্রু। হিটলার এটাকে ইহুদীদের মতবাদ বলে মনে করতো, গোলওয়ালকার মনে করে "বিদেশী মতাদর্শ" এটা, যদিও হিটলারের মতবাদ তার পরম আরাধনার বস্তু! মওদুদির কাছে 'খোদার চেয়ে বেশি জনগণের ক্ষমতা! সুতরাং ওটা কাফেরদের দর্শন।'

এটা কি আকস্মিক

আশির দশকের প্রথমার্ধের শেষভাগের পূর্বে ধর্মীয় মৌলবাদ বা ধর্মীয় রাষ্ট্র ছিল একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা। কিন্তু ৮৫-৮৬ সাল থেকে ধর্মীয় পুনরুত্থানবাদ এবং রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে ধর্মকে সামনে আনাটা একটা 'গ্লোবাল ফেনমেনন' হয়ে দাঁড়ায়। শাসক-সম্প্রদায়ের একটা গোষ্ঠী অন্য গোষ্ঠীকে ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য ধর্মকে ব্যবহারে কিংবা কোনো দেশের মধ্যে অস্থিরতা সৃষ্টি করে দরকষাকষিতে সুবিধাজনক অবস্থানে থাকার জন্য 'এইড্স্' এবং 'ধর্ম'কে কাজে লাগানো একটা সাধারণ রীতি হয়ে দাঁড়ায়। মনে রাখতে হবে, এই সময়েই ধসে যাওয়া সমাজতান্ত্রিক মডেলের কফিনে শেষ পেরেক ঠোকার কাজটা শুরু হয়ে যায় গর্বাচভ আর তেন-সিয়াও-পিং-এর নেতৃত্বে। সাধারণ মানুষের আত্মবিশ্বাস এবং নিজের ভবিষ্যৎ গড়ার জন্য নিজের হাত ও মস্তিষ্কের ওপর আস্থার মতাদর্শগত ভিত সমাজতান্ত্রিক সংহতি। আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদের ঔরসে এবং সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোতে পরাজিত শ্রেণীগুলোর বংশধরদের গর্ভে অন্ধকারে বেড়ে ওঠা জাতীয়তাবাদ দিয়ে আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদ এই প্রথম সমাজতান্ত্রিক বুনিয়াদে আঘাত হানে। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলো কার্যত জাতীয়তাবাদী দেশে পরিণত হয়। এই জাতীয়তাবাদকে মোকাবিলা করার জন্য এখন তারা ধর্মকে আমদানি করছে। ৮৫-৮৬ সালের বিশ্বধর্ম কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত, 'এক ব্রহ্মাণ্ড, এক মালিক'-এর পার্থিব প্রয়োগ 'এক বিশ্ব, এক প্রভু'কে কার্যকরী করার জন্য একটা আন্তর্জাতিক কেন্দ্র থেকেই এটা চালনা করা হতে থাকে। (কোথাও কোথাও সেটা যে ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন হচ্ছে না, তাও নয়)। অর্থাৎ, পুরনো সাম্রাজ্যবাদী এবং উঠতি সাম্রাজ্যবাদী বা প্রভুত্ববাদী রাষ্ট্রগুলোর নিজেদের মধ্যকার তীব্র প্রতিযোগিতায় বিশ্বকে ভাগ, আবার ভাগ, পুনরায় ভাগ করার রণ-কৌশলে ফ্রন্ট গঠনের কিম্বা নিজের বাজার সংহত করার কাজে ধর্মের মাধ্যমে রাষ্ট্রগুলোর ওপর কব্জা মজবুত করাটাই তাদের উদ্দেশ্য। যেটাকে বলা হচ্ছে 'ইউনি-পোলার বিশ্ব।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ধর্মীয় মহাসম্মেলন

সর্বধর্মের মহাসম্মেলন একটা বিচিত্র বস্তু! আজ পর্যন্ত যেসব ধর্মগুলো বাহ্যত পরস্পরকে নির্মূল করার নীতিতে বিশ্বাসী, তারাই কিন্তু বিশেষ বিশেষ সময়ে মহাসম্মেলনে মিলিত হয়। সেই বিশেষ সময়টা হলো—কোন সাম্রাজ্যবাদী দেশের সংকট। দুটো বিশেষ ধর্ম-মহাসম্মেলন আমরা দেখেছি। (এক) ১৮৯৩ সালে। (দুই) ১৯৮৫-৮৬ সালে। ১৮৭১ সালে আমেরিকান প্রেসিডেন্ট গ্রান্ট দক্ষিণের ভূ-স্বামী এবং দাস-মালিকদের কাছে আত্মসমর্পণ করেন। এরা পুনঃপ্রতিষ্ঠা পেয়ে দক্ষিণের মানুষগুলোকে মজুরীদাসে পরিণত করে। যার বর্ণনা, হাওয়ার্ড ফাস্ট, সিনক্লেয়ার প্রমুখ লেখকের লেখাতে আমরা পাই। এর ফলে, যে বিশাল পরিমাণ উৎপাদন শক্তি মুক্তি পায় এবং উৎপাদন বেড়ে যায়, সেটা সমগ্র আমেরিকার ঘাড়ে ডাঃ ফাউস্টের শয়তানের মতো চেপে বসে। এই অবস্থা থেকে মুক্তি পাবার জন্য উঠতি আমেরিকা বাজারের সন্ধানে এবং বাজারে ঢোকার পথ খুঁজতেই চিকাগো মহাসম্মেলনের আয়োজন করে। এঙ্গেলস-এর ভাষায় 'এই রকম সংকটের সময় বুর্জোয়ারা ভীষণ ধর্মনিরপেক্ষ হয়ে যায়। নিজের দেশের ধর্মে না কুলালে, বিদেশের ধর্ম আমদানি করতেও তাঁরা উৎসাহী হয়ে পড়ে।' 'রামকৃষ্ণ মিশন'-এর আমেরিকান মদতের রহস্য এইখানেই। এদের কারুর কারুর ব্রিটিশ বিরোধিতার ইতিহাসটা হল্যে আসলে আমেরিকান 'ট্রেড অ্যাসোসাডার ইন ইণ্ডিয়া।' যেমন ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ার দক্ষিণ আফ্রিকান ট্রেড অ্যাম্বাসাডার এখানে জাতীয় নেতা হয়ে যায়।

১৯৮৫-৮৬ সালে সংকটের চরিত্রটা কী? ইউ-এন-ওর হিসাবে প্রযুক্তি এমন একটা স্তরে উন্নীত হয়েছে যে, যদি মানুষ সমস্ত প্রযুক্তির সমস্ত দক্ষতাকে কাজে লাগায় তা হলে প্রতিদিন মাত্র দু-ঘণ্টা পরিশ্রম করলেই সমগ্র বিশ্ব থেকে ক্ষুধা-দারিদ্র্য এবং অনাহার ও মৃত্যুকে তাড়ানো যায়। অর্থাৎ, 'যদি কাজে লাগায়'। কিন্তু লাগাবেটা কে? প্রযুক্তির বিকাশের মালিকানাটা যাদের তারা যদি উৎপাদনের সামাজিক চরিত্রটার সঙ্গে খাপ-খাইয়ে ভোগটা সামাজিক করে দেয় তাহলেই সমস্যাটা মিটে যায়। না, সেটি তারা করতে পারে না। বিপরীতে যথেষ্ট মুনাফা দিতে না পারার অপরাধে ১২৮টা দেশের মধ্যে ৯৮টা দেশকে তারা দেউলিয়া ঘোষণা করে দিয়েছে। এমনিভাবে যাদের প্রয়োজন আছে তারাও বাজার থেকে কিনতে পারছেন না। প্রচুর মাল, ক্রেতা বাজার সীমিত। মাল-উৎপাদকদের মধ্যে প্রতিযোগিতা তখন তীব্র।

এই প্রতিযোগিতা মোকাবিলা করার জন্য ইয়োরোপ তার কনফেডারেশান গঠন করে বাজারে হাজির। জাপানও বাজারে হু হু করে এগিয়ে আসছে। আমেরিকা ক্রমশ কোণঠাসা হতে হতে তার নিজস্ব অর্থনীতিকে পণ্য উৎপাদনমুখীন অর্থনীতি নির্ভরতা থেকে, অর্থাৎ পুঁজিবাদী অর্থনীতি থেকে সরিয়ে এনে বেনিয়া অর্থনীতিতে রূপান্তরিত করেছে। প্রকৃতপক্ষে আমেরিকান অর্থনীতি আজ অধঃপতিত হয়েছে 'বেনিয়া-অর্থনীতিতে (ট্রেডার্স ইকোনমি)।' তার প্রধান মাল হলো সমরাস্ত্র বা ঐ জাতীয় বস্তুগুলো। স্বভাবতই এই 'মাল' বাজারে কাটাতে গেলে তার বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রক্ষমতাতে নিরঙ্কুশ আধিপত্য

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চায়। এই আধিপত্যের জোরে সেই সমস্ত দেশে রাষ্ট্রের সাহায্যে প্রতিযোগীদের (বিভিন্ন আইন, সুযোগ-সুবিধা) ঠেকাতে পারবে। বাঙলা দেশের নির্বাচনে এটাই আমরা দেখেছি। আমেরিকান পুঁজি (ভায়া সৌদি) বনাম জাপানী পুঁজির লড়াই চলছে। অর্থাৎ এই সমস্ত দেশে আমেরিকা এমন একদল শাসক চায়, যারা বাধাহীনভাবে তার মাল কাটাতে পারবে। জনগণের মধ্যে তাদের গ্রহণযোগ্যতা আছে। এবং সেই গ্রহণযোগ্যতা গড়ে তোলার রণকৌশল হবে 'নিরাপত্তাহীনতা'র প্রশ্নটা (মানবাধিকার)। সোজা কথায়, তথাকথিত গণতান্ত্রিক উপায়ে একটা শক্ত সরকার, যার হাতে একটা আইনোর্ধ্ব শক্তি থাকবে; জনগণ নামক মৃতের বোঝাদের ঠাণ্ডা করার জন্য। একমাত্র ধর্মই তার অনুকূলে এই জনগণ গড়ে তুলতে পারে। এখানেই অতীতের ধর্মীয় মৌলবাদ থেকে বর্তমানের মৌলবাদের ফারাক। প্রথমত, এটা একটা আন্তর্জাতিক 'ফেনমেনন', নয়া-নাৎসিবাদী পুনরুত্থানের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত। দ্বিতীয়ত, এটা একটা কেন্দ্র থেকেই তার অনুকূল রাষ্ট্র গঠনের জন্য জনগণের মধ্যে একটা বাতাবরণ তৈরি করার হাতিয়ার। তাই, বর্তমানে কোনো মৌলবাদকেই ছোট করে দেখা যায় না। ধর্মীয় আচার-আচরণের মধ্যে মৌলবাদ খুঁজতে যাওয়ার অর্থ একটা গোপন অভিসন্ধিকে আড়াল করা। বি-জে-পির সদর দপ্তরে জমায়েতের নামাজ কিংবা যোশির ইফতারে যাওয়ার ঘটনা, অথবা অশোক সিঙ্ঘলের বাঙলা দেশের মৌলবাদীদের সঙ্গে বসে (মৌলানা আজিজুল হক) বাবরি মসজিদ ধ্বংস করার দিন ধার্য করা, কোনো কাকতালীয় ঘটনা নয়। প্রতিটি মৌলবাদী তত্ত্বকে তাই ধরতে হবে তাদের রাষ্ট্রনীতির মধ্যে। তারা আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের ইচ্ছা মোতাবেক, তাদের টাকায় ধর্ম থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে কেমনভাবে রাষ্ট্রপুঞ্জ এবং রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বটা জনগণকে গেলাতে চাইছে সেটিই বড় কথা।

AMARBOI.COM

ইসলামের রাষ্ট্রনীতি সম্পর্কে আরও কিছু কথা

ইসলাম ধর্মীয় এবং ঐস্লামিক রাষ্ট্রনীতির মূলকথা:- আইন রচনা ও বিধান প্রণয়নের অধিকার আল্লাহ ছাড়া আর কারো নেই। সমগ্র মুসলমান মিলিত হয়েও এই আইন রচনা করতে পারে না। খোদার দেওয়া আইনের কোনরকম পরিবর্তন বা সংশোধন করার অধিকার কারুর নেই। খোদার তরফে তার নবী যে বিধান পেশ করে থাকে ইসলামি রাষ্ট্রের সেটাই চিরন্তন ভিত্তি। আর কেবলমাত্র এই কারণেই একজন শাসক জনগণের আনুগত্য দাবি করতে পারে। (অর্থাৎ, এটা করলেই সব করা হয়)। সুতরাং ইসলামি রাষ্ট্রকে কোনমতেই এমন একটা রাষ্ট্র বলা চলে না, যেখানে অনেকের মতামতের ওপর 'আইন' বা বিধান রচনা করা কিম্বা পাল্টে দেওয়া যায়। ফলত ঐস্লামিক রাষ্ট্র প্রচলিত 'গণতান্ত্রিক-রাষ্ট্র' নয়। মুসলিম মৌলবাদীরা এই 'স্বপ্নে'র রাষ্ট্রটাকেই 'হুকুমাতে ইলাহিয়া' বা খোদায়ী-শাসন বলে থাকে। অনেকটা রামরাজ্য বা 'বেনেভোলেন্ট অটোক্র্যাসি'র মতো। এগুলো সবই 'থিওক্র্যাসি'। ইয়োরোপে আমরা যে সমস্ত থিওক্র্যাসি রাষ্ট্র দেখেছি, সেগুলো ছিল 'যাজক-শাসিত' রাষ্ট্র। 'ইসলামি- থিওক্র্যাসি'তে আইনত সমস্ত মুসলমানরাই (লক্ষ্য করুন, অন্য কেউ নয়। গোলওয়ালকারের আমাদের জাতি শীর্ষক পুস্তকের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সঙ্গে মিলিয়ে দেখুন, কী অদ্ভুত মিল! আর আশ্চর্যজনক সাদৃশ্য হিটলারের মেইন ক্যাম্ফে বর্ণিত রাষ্ট্রনীতির সঙ্গে।) পয়গম্বর বর্ণিত খোদার অনুশাসন কায়েম করতে পারে এমন শাসক নির্বাচিত করতে পারবে। এরই জন্য মৌলবাদীরা এটাকে 'খোদায়ী গণতন্ত্র' বলে অভিহিত করতেই ভালোবাসে। [হিটলারের সমাজতন্ত্রের আগে 'ন্যাশনালিস্ট' যোগ করার মতো আর কি?] এর কারণ কি? কারণ তাদের বিশ্বাস তাহলে খোদার সর্বময় কর্তৃত্বের অধীনে 'মুসলমানদের সীমাবদ্ধ কর্তৃত্ব' কায়েম করা যাবে।

শাসন বিভাগ

শাসকসম্প্রদায় মুসলমান জনসাধারণদের ভোটেই নির্বাচিত হবে এবং মুসলমানরা তাদের পদচ্যুতও করতে পারে। এরা 'শরিয়তে' যে-সমস্ত বিষয় সম্পর্কে বিধান নেই সেগুলো সম্বন্ধে সম্মিলিতভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবে, এটাকে 'ইজমা' বলা হয়। সংক্ষেপে, মুসলমানরা মজলিস এবং আমির নির্বাচন করবে। আমির খোদার বিধান (যা কিনা কোরাণ, হদিশ এবং বিভিন্ন সময়ের ইজমা-তে পাওয়া যায়) অনুসারে শাসন করবে। আমির মজলিস-এর মতামত নেবে কিন্তু যদি আমির-এর সঙ্গে মজলিসের দ্বন্দ্ব দেখা দেয়, তাহলে শেষ কথাটা বলবে আমির। আমির-এর বিরুদ্ধে কাজ করা চরম পাপ।[৫]

তবে 'আমির'-কে মনে রাখতে হবে যে সে খোদার বিধানগুলো কার্যকরী করার যন্ত্র মাত্র। এগুলোর মধ্যে আবার কতগুলো আছে অলঙ্ঘনীয় বিধান বাকি, অনেক বিধানই 'ইজমা' দ্বারা সংশোধন করা যায়। এই অলঙ্ঘনীয় বিধান বা 'কোয়াসেস' অর্থাৎ খোদার বিধান সম্পর্কে ব্যাখ্যা করার অধিকারী কে? অধিকারী 'ইজ্‌তে হাদী'-রা অর্থাৎ ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সংবিধানের নামে 'মিযান'-এর শাসন, অর্থাৎ মোল্লাদের শাসন।

সাধারণ মানুষের প্রতি সীমাহীন ঘৃণা

সমস্ত একনায়কতন্ত্রের মতোই ইসলামী রাষ্ট্রের ধারণার পেছনে আছে জনগণের প্রতি এক সীমাহীন ঘৃণা। জনগণ নিজের ভালো বোঝে না। তারা 'নফসের খাহেস' বা দাস অর্থাৎ (রিপুর সেবাদাস), রিপু, বা 'নফস' নামক শয়তান দ্বারা চালিত। তাই তাদের একটা সীমা মেনে চলতেই হবে। কী সেই সীমা?

পারিবারিক জীবনে

হদিশ এবং কোরাণ অনুসারে অলঙ্ঘনীয় বিধানগুলোর মধ্যে পড়ে: (ক) পর্দা এবং সংসারে পুরুষের কর্তৃত্ব (খ) পিতামাতার অধিকার (গ) স্ত্রী-ধন এবং সম্পত্তি (ঘ) ছেনা বা রকীয়া ইত্যাদি।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, 'তালাক' কিন্তু অলঙ্ঘনীয় বিধানের মধ্যে পড়ে না। কারণ, মুসলমান বিবাহটা যত না ধর্মীয় তার থেকে অনেক বেশি আইন বিভাগীয়। অনেকটা আধুনিক 'রেজিস্ট্রি' বিবাহের মতো। 'গাওয়া' (সাক্ষী), 'উকিল' (ব্যাপিকা) প্রভৃতি মূর্ত সাক্ষীরাই বিবাহের যুক্তিসিদ্ধতা অনুমোদন করে। মৌলবী সেখানে ঘোষক এবং

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খোদার দরবারে বিবাহ-টাকে অনুমোদন করার আর্জি পেশকারী মাত্র। এরই জন্য তালাক-এর প্রশ্নটাকে সামনে এনে আসল প্রশ্নগুলো এড়িয়ে গেলে মৌলবাদীদেরই হাতকে শক্ত করা হয়। দ্বিতীয়ত, বহুবিবাহ (চার) এবং 'তালাক' ব্যাপক মুসলমানের সমস্যা নয়। 'যাগো প্যাটের চিন্তা নাই, ট্যাহা লইয়া কি করুম বুঝতে পারছে না, চ্যাঁটের চিন্তা তাগো-র চিন্তা।' অর্থাৎ সমস্যাটা 'যোনি'র নয়, জমির।

মণিশঙ্কর আয়ারকে উদ্ধৃতি করে বলা যায়, 'এই যৌন ঈর্ষাই বি-জে-পি'র সাধু এবং সাধ্বীদের মুসলমান নিকেশে ঠেলে দেবার অন্যতম কারণ।'

ব্যাপারটা একেবারে উড়িয়ে দেবার মতো কি? না হলে গোলওয়ালকারের জাতি আর মওলানা মওদুদির খোদায়ী গণতন্ত্রের ফারাক একেবারেই নেই। এমন কি 'ব্যক্তি-আইনের' (পার্সনাল ল') ক্ষেত্রেও না। তারা মুসলমানদের কুৎসিতভাবে চিহ্নিত করার জন্য যে সব সংস্কারগুলো (কারণ, সংস্কার মানেই 'কু') তুলে ধরে, নিজেদের স্বপ্নের সংবিধানে সেগুলোই দাবি করে। এটা অবশ্যই লক্ষ্য করার বিষয়।

প্রগতিশীলতার তত্ত্বের বুজরুকি

'বুজরুকি' কথাটা নাকি 'বুজরুগ' অর্থাৎ নিজেকে জ্ঞানী মনে করা থেকে এসেছে। 'জ্ঞানী'দের ধান্দাবাজিটাই 'বুজরুকি' অর্থে ব্যবহৃত। এই বুজরুগরাই ইসলামী রাষ্ট্র সবচেয়ে সুবিধাভোগী সম্প্রদায়। এবার বুজরুকিটা দেখা যাক:

(১) যে-যে কারণে অনেকে মুসলমান ধর্মকে সাম্যের অনেক কাছাকাছি মনে করেন তার একটা হলো 'স্ত্রীধন' বা সম্পত্তির অধিকার। পুরুষের সীমাহীন এবং প্রশ্নাতীত কর্তৃত্ব-এর সঙ্গে এই অধিকারকে মিলিয়ে দেখলে কী হয়, সেটা আমরা শাহবানু মামলায় দেখেছি। এটা মেয়েদের ঘরে বন্দী করে রেখে যথেচ্ছ ব্যবহার করার (মেয়ে ভোগ করার) একটা ফাঁদ। এটা যদি 'বিপ্লবী' হয় তো 'লালবাতি' এলাকাগামীদের সেখানকার মহিলাদের টাকা-গয়না দেওয়াটাও বিপ্লবী। দুটোই হলো বাধ্য-বাধকতার দমবন্ধ করার খাঁচা।

(২) 'পরকীয়া' বা 'জেনা' মুসলমান ধর্মে গর্হিততম পাপ। ধর্ষণটা কিন্তু আবার সম্মান বা মানসিক ক্ষতিটাকে বিচারে আনে না। (যেমন ধর্ষণের ক্ষেত্রে আমাদের বিচার-ব্যবস্থা করে থাকে)। এটা পাপ, কারণ অন্যের ভোক্তা বা সম্ভাব্য ভোক্তাকে তুমি ভোগ করেছ তাই। অর্থাৎ, চুরি কিংবা ডাকাতির সমপর্যায়ের ব্যাপার। এহ বাহ্য। এই পাপের বিচার করবে কে?

হাদিশ বলছে: সেই ব্যক্তিই এই বিচার করতে পারে, যে জীবনে মনে প্রাণেও কোনোদিন জেনা করেনি। (অর্থাৎ, যার 'স্বপ্নদোষ' হয়নি!) এরকম বিচারক তো মেলা ভার। নেই, নেই, নেই, তাহলে কী বিচার হবে না? তা তো হবেই। যার টাকা আছে সে এরকম 'কাজী' খুঁজে পাবে। 'ইজতে হাদী'রা তাকে অনুমোদন করবে। ব্যস! ব্যাপারটা একেবারে মনুসংহিতার মতোই ঘটবে—ব্রাহ্মণরা যদি এই কাজ (পরগামিতা) করে তাহলে তাকে তার সম্পত্তিসহ নির্বাসন দাও। শূদ্ররা করলে একটা একটা অঙ্গচ্ছেদ

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করে কোতল করো।

শেষ কথা

শরিয়তী আইন ধ্বংস হোক, এটা তাই বি-জে-পি চায় না। কারণ, তারা নিজেরাও এই আইনের অনুগামী। জনসাধারণকে ভয় ধরাবার, আতঙ্কিত করার এমন সুন্দর ব্যবস্থা সাম্রাজ্যবাদও হাত ছাড়া করে না। তাই, এদেশে যারা আর-এস-এস, বাংলা দেশে বা পাকিস্তানে তারাই 'জামায়েত'। একই প্রভু, একই স্বার্থ, একটাই লক্ষ্য: পৃথিবীটাকে একটা মাত্র প্রভুর অধীনে আনা। এটাই মৌলবাদের মৌলিক ধান্দা। বাকি সব কথার কথা।

এই প্রসঙ্গে ভারতের আদর্শ সংবিধান কেমন হবে, বিশ্বহিন্দু পরিষদ সেটার একটা ২৮ পৃষ্ঠা খসড়া হাজির করেছে। তাতে অনেক কিছুর মধ্যে কয়েকটা মজার কথা আছে:- (১) ভারতের সমাজব্যবস্থা হবে প্রাচীন আর্যদের বর্ণাশ্রম ভিত্তিক..... (২) 'সতী' বা 'সহমরণে'-র ব্যাপারে রাষ্ট্র হস্তক্ষেপ করবে না। ইচ্ছা থাকলে শহীদের মর্যাদা নিয়ে কোন 'স্ত্রী' তার স্বামীর চিতার সহগামিনী হতে পারে..... (৩) হিন্দুদের 'বিয়ে'র ব্যাপারে কোন সংখ্যার বাধ্যবাধকতা নেই।.....

ভারতের দক্ষিণপন্থী ফ্যাসিস্ত সংগঠনগুলো

বোনাপার্ট থেকে মুসোলিনির অভ্যুত্থানের কারণ হিসাবে অনুসন্ধান করলে একটা চিত্র পরিষ্কার হয়ে ওঠে, প্রত্যেকটা দেশেই এরা ক্ষমতা লাভের পূর্বাহ্নে একটা অরাজক অবস্থা বিরাজ করছিল। একদিকে প্রতিষ্ঠিত এবং প্রচলিত শাসকরা জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ তো করতে পারছিলই না, অন্যদিকে জনগণও ক্ষমতা দখল করার দিকে এগুতে ভরসা পাচ্ছিলেন না। তাঁদের না ছিল ক্ষমতা দখলের মত একটা কেন্দ্র, যে কেন্দ্রগুলো ছিল সেগুলোও দুর্নীতিগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল (যেমন জার্মান কমিউনিস্ট পার্টি যার নাম ছিল জার্মান সোস্যাল ডেমোক্র্যাসী দল বা ইতালির সমাজতন্ত্রীরা) না ছিল জনগণের কোন বাহিনী। অর্থাৎ একটা দেশে যখন শাসক সম্প্রদায় শাসন করার গ্রহণযোগ্যতা হারিয়ে ফেলে, এবং জনগণকে ক্ষমতা দখলের পথে অভ্যুত্থানের পথে পরিচালিত করার মত কোন শক্তি থাকে না, সেই শূন্য অবস্থায় একটা সর্বশক্তিমান জাতীয় হিরোর আবির্ভাবের জন্য গণমানস তৈরি থাকে। মানুষ একজন আত্মপ্রত্যয়যুক্ত শক্তিমান নেতাকে বরণ করার জন্য প্রস্তুত হয়েই থাকেন। তাঁদের জীবনকে দাঙ্গা, লুঠতরাজ, খুন ইত্যাদি দিয়ে আরও নিরাপত্তাহীন করে তুললে গণভিতটা আরও মজবুত হয়ে ওঠে।

ভারতবর্ষে এই অবস্থা বিরাজ করছে দীর্ঘদিন ধরে। এরপর আর্য-হিন্দুদের ধর্মীয় আচরণ এবং গীতার বাণী 'যুগে যুগে আমি এসে থাকি'—একনায়কত্বের দর্শন তৈরি করে রেখেছে দীর্ঘ বছর ধরে। তাই অর্থনৈতিক সংগঠনের জোরে নয়, ভারতবর্ষে 'একনায়ক' (বা গোষ্ঠী-নায়কতন্ত্র) আসবে ধর্মের হাত ধরে জাতীয়তাবাদের আড়ালে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হিন্দু-মৌলবাদী সংগঠনগুলো ইতিহাসের সাম্প্রদায়িকীকরণের মাধ্যমে যে জাতীয়তাবাদ চালু করছে তার একটাই উদ্দেশ্য: গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের ছত্রছায়ায় এই জাতীয়তাবাদের গণতন্ত্রীকরণ। একবার এই কাজটা সম্পূর্ণ করতে পারলে সমস্ত সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর কর্তৃত্ব চাপিয়ে মানুষকে একটা নির্দিষ্ট অর্থনৈতিক প্রভুর সেবায় নিয়োগ করাটা সহজ হয়ে যাবে। এই কাজে সমস্ত গণতান্ত্রিক দলগুলোর মধ্যে তাদের প্রেসার গ্রুপ সক্রিয়, তেমনই তাদের একেবারে নিজস্ব রেজিমেন্টেড দলও আছে যারা 'গণতান্ত্রিক', 'গণতন্ত্র বহির্ভূত' দু'রকমেই কাজ করে থাকে। ঘৃণা, সন্দেহ, সত্যের বিকৃতির মাধ্যমে জনগণের মধ্যে একটা নিরাপত্তাহীনতার বাতাবরণ সৃষ্টি করাটাই তাদের রণকৌশল। ভারতবর্ষের বুকে এই রকম সংগঠনগুলোর নাম:

হিন্দু- ফ্যাসিবাদী সংগঠন

১। রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘ বা আর-এস-এস
২। বিশ্ব হিন্দু পরিষদ
৩। হিন্দু মুন্নানি
৪। আর্য সমাজ
৫। শিব সেনা
৬। ভারতীয় জনতা পার্টি
৭। সন্ত সমিতি
৮। হিন্দু মহাসভা
৯। বজরঙ দল

AMARBOI.COM

এগুলোর আবার বিভিন্ন শাখা সংগঠন আছে। যাই হোক না কেন মূলত সব সংগঠনের জননী রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘ। আগেই বলেছি; মপলা কৃষকদের (যাঁরা ছিলেন ধর্মবিশ্বাসে মুসলমান) সামন্ত বিরোধী এবং বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনের প্রতিক্রিয়াতেই ডাঃ কেশব বলিরাম হেড়গেওয়ার, যিনি চিতপাওয়ান ব্রাহ্মণ-এর প্রতিষ্ঠাতা, সরাসরি এক জাতি তত্ত্বের প্রবক্তা হয়ে ওঠেন। সেটাকে বাস্তবায়িত করার জন্য এরা 'সন্ত্রাসে' বিশ্বাসী। সন্ত্রাস এদের ঘোষিত নীতি। নীতি-গত ভাবে কেবলমাত্র

(১) 'চিতপাওয়ান ব্রাহ্মণ' (নীল চক্ষু ব্রাহ্মণ-রাই) এই সংগঠনের সর্বোচ্চ নেতা হতে পারে।

(২) কোন মহিলা আর-এস-এস-এর সদস্য হতে পারবেন না।

(৩) সাম্যবাদ, শিখধর্ম এবং ইসলাম ধর্মের সমূলে উচ্ছেদটাই এদের কার্যসূচীর মূল লক্ষ্য।

(৪) দক্ষিণী দ্রাবিড় সম্প্রদায়কে সম্পূর্ণভাবে উচ্ছেদ করে আর্য ভারত গঠনে বিশ্বাসী।

(৫) সরাসরি 'স্ত্রী-দাহ' প্রথায় বিশ্বাসী।

(৬) প্রাচীন ভারতের বর্ণ-ভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থাকে ভারতীয় সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত করার জন্য আন্দোলন করছেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

(৭) সংস্কৃত ভাষাকে ভারতের রাষ্ট্রীয় ভাষা করার দাবী করেন।

প্রচার কৌশল

গুজব, বিকৃতি এবং ইতিহাসের বিকৃতি সাধনের জন্য বিজ্ঞানের অপপ্রয়োগ করে', মানুষকে উত্তেজিত করা।

সাংগঠনিক নীতি

একজন সুপ্রীম রাজনৈতিক কমান্ডের নেতৃত্বে একদল বিশেষ শিক্ষা-প্রাপ্ত লোক—তাদের নির্দেশে সশস্ত্র স্বেচ্ছাবাহিনী গড়ে তোলা।

অপারেশন

অপারেশনের লক্ষ্য আতঙ্ক সৃষ্টি করা। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে দাঙ্গা বাধিয়ে তোলা। বেছে বেছে রাজনৈতিক এবং প্রভাবশালী ব্যক্তিদের নিকেশ করা।

ইতিমধ্যে যা করেছে বলে দাবী করে

এবং এগুলো তারা করে চলেছে সেই তিরিশের দশক থেকেই। 'হরিজন'দের সমর্থন করার অপরাধে এরা:- (ক) গান্ধীকে হত্যা করেছে বলে দাবী করে। (খ) কেউ কেউ মনে করেন ভারতীয় সংবিধানের রচয়িতা ডাঃ আম্বেদকরকে এরা বিষপ্রয়োগে হত্যা করে। (গ) তামিলনাড়ুর নিম্নবর্ণী নেতা কামরাজ নাদারকে হত্যার চেষ্টা করেছে সন্দেহ করা হয়ে থাকে। (ঘ) ইন্দিরা গান্ধীর ব্লু-স্টার অপারেশন-এর দৃঢ় সমর্থক। (ঙ) এছাড়া কর্পূরি ঠাকুর এবং দেবরাজ উরস্-কে হত্যার জন্য একটা বড় অংশ ওদের কৃতিত্ব দেন। (চ) ইদানীংকালের সব চেয়ে বড় ঘটনা: কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারের (উত্তরপ্রদেশ) সহায়তায় বাবরি মসজিদ ধ্বংসের সম্পূর্ণ কৃতিত্বটাই এই সংগঠন দাবী করেছে (অবশ্যই শিব সেনার সঙ্গে)।

বর্তমানে ওদের সাংগঠনিক লক্ষ্য

মুসোলিনির কর্মকৌশল অনুসারে এই সংগঠনটা ভারতবর্ষের প্রতিটি রাজ্যে বিচারক, সাহিত্যিক, পুলিশ অফিসার এবং প্রশাসকদের কেনার একটা কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। সমস্ত অবসর প্রাপ্ত পুলিশ এবং মিলিটারি অফিসারদের দলে টেনে তাদের হাতে অস্ত্র ট্রেনিং-এর ভার অর্পণ করা হচ্ছে। ইজরায়েলের মোসাদ (সন্ত্রাসবাদে শিক্ষা দেবার একটা সংগঠন)-এর সঙ্গে এদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আজ স্বীকৃত।

মন্তব্য

হিটলারের ২২-৩০ সালের কর্মসূচীর সঙ্গে একেবারে আক্ষরিক সাদৃশ লক্ষণীয়।

মুসলিম সংগঠন

আর্য হিন্দুদের 'এক জাতি তত্ত্বে'র প্রতিক্রিয়াটাই ভারতবর্ষে মুসলমানদের 'দ্বি-জাতি'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তত্ত্বের ক্ষেত্রটা প্রস্তুত করে। একই রকমভাবে গড়ে ওঠে মুসলিম ফ্যাসিবাদী সংগঠনগুলো। এরা মূলত দুভাবে বিভক্ত। ইরানপন্থী এবং সৌদিপন্থী। (১) জামায়েত ইসলাম, (২) হেজবুল্লা, (৩) তবলিগ জামায়েত (৪) ঐস্লামিক ছাত্র মুভমেন্ট প্রভৃতি সংস্থার নেতৃত্বে নানান শাখা উপশাখাতে বিভক্ত এই সংগঠনগুলো। ভারতবর্ষের বুকে এদের সন্ত্রাসবাদী কাজ তেমনভাবে লক্ষ্য করা না গেলেও পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এরা বেশ সক্রিয়। সাধারণ মুসলমানদের সংস্কৃতিগত মানকে নিম্নস্তরে বেঁধে রেখে পৃথিবীব্যাপী মুসলমানদের আধিপত্য (মানে অভিজাত মুসলমানদের) কায়েমের লক্ষ্যে এদের সমস্ত কর্মসূচী নির্ধারিত। সেই জন্যই মুসলমানদের কোন আর্থ-সামাজিক প্রশ্নের নয়, সেরেফ, ধর্মের ভিত্তিতে রেজিমেন্টেড করে তোলাটাই এদের সাংগঠনিক নীতি। হিংসা, বিদ্বেষ, খুনখারাপিতে সমান উৎসাহী। সৌদির মাধ্যমে একটা অংশ সরাসরি আমেরিকার স্বার্থে কাজ করে থাকে। এই অংশটার সঙ্গে আর-এস-এস-এর যোগাযোগ প্রমাণিত।

ভারত কোন্ পথে

এখন প্রশ্ন ভারতবর্ষে ফ্যাসিবাদ আসবে কি? এই প্রশ্নের উত্তরে আগেই বলেছি:- ভারতবর্ষে ফ্যাসিবাদ আসবে ধর্মের হাত ধরে। কারণ এখানে প্রচলিত সামাজিক-দর্শন- বহু যুগ ধরে একজন সর্বাধিনায়কের অভিভাবকত্বের পটভূমি তৈরি করে রেখেছে। আর্থ সামাজিক কারণেই সাম্প্রদায়িকতার আবহাওয়া বিদ্যমান। একদিকে হিন্দু ধর্মের 'রহস্যবাদ' বা মিস্টিসিজম-এর প্রতি তরুণদের এবং 'বিচ্ছিন্ন আউটসাইডারের' আকর্ষণ বাড়ছে। অন্যদিকে মুসলমানরাও ইসলাম ধর্মের অন্ধ বিশ্বাসকে সযত্নে অনড় অটল বলে রক্ষা করে চলেছে। ধর্মীয় সংস্কারগুলোকে প্রচার মাধ্যমে এবং রাষ্ট্রের আনুকূল্যে উৎসাহিত করার ফলে 'যুক্তিবাদ' এবং 'ইতিহাস' পিছনে পড়ে গেছে। অন্ধ আবেগ একটা চাপা সামাজিক প্রভাবের সৃষ্টি করে চলেছে। অর্থাৎ ভারতবর্ষে আর্থ-রাজনৈতিক ভিত্তি এবং সামাজিক মনস্তত্ত্ব এমন একটা জায়গায় এসেছে, যখন মানুষ একটা ডুসে বা ফুয়েররের জন্য প্রতীক্ষা করছে যিনি ধর্মের হাত ধরে রাজনৈতিক ক্ষমতার ভেলকি দেখাতে পারেন। গণ-প্রচার মাধ্যমগুলো 'সর্ববিপদহন্তা' 'রাজা এবং ভগবান'-এর একদেহে মিলেমিশে যাওয়া একটা রূপ দেখিয়ে জনগণকে সেই রকম একটা মূল্যবোধে শর্তাধীন করে তোলার কাজে সচেষ্ট। (রামায়ণ, মহাভারতের প্রদর্শন)।

বিশ এবং তিরিশ দশকের ইতালি এবং স্পেনের সঙ্গে আমাদের আর্থ সামাজিক অবস্থা এবং সামাজিক মনস্তত্ত্বের সাদৃশ্য লক্ষণীয়। আগেই বলেছি আমেরিকা তার নিজের স্বার্থে এই দেশের অর্থনীতিকে স্ব-নির্ভর হতে দেবে না। স্পেনের গৃহযুদ্ধে (ফ্যাসিবাদী একনায়ককে ক্ষমতাসীন করানোর কাজে) ইতালি এবং ফ্রান্স সরাসরি এগিয়ে এসেছিল। এখানেও সমস্ত ধর্মীয় সংগঠনগুলো এবং তথাকথিত জাতীয়তাবাদী এবং সমাজতন্ত্রী দলগুলোর একটা অংশকে অর্থনৈতিক মদত দেবার জন্য বৃহৎ শক্তির অভাব হবে না। এই সমস্ত সংগঠন এবং ব্যক্তিগুলো তাদের বক্তব্যে এবং প্রচারে সরাসরি সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র প্রভৃতি ধারণা, ব্যবস্থা এবং প্রতিষ্ঠানগুলোকে নস্যাৎ করে চলেছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিন্তু মনে রাখতে হবে আজকের ফ্যাসিবাদ বিশের দশকের ফ্যাসিবাদ বা নাৎসিবাদের কার্বন কপি হতে পারে না। তাদের দর্শন তাদের কার্যপদ্ধতিকে কাজে লাগিয়ে তারা ক্ষমতা দখলের বাতাবরণ তৈরি করতে পারে মাত্র।

কিন্তু যুগের বৈশিষ্ট্যই তাকে এইগুলো কার্যকরী করার পথে বার বার বাধার সামনে ঠেলে দেবে। অননুগামিতাই এই যুগের বৈশিষ্ট্য। একজন সর্বাধিনায়ককে বেশিদিন ধরে চাপিয়ে রাখা অসম্ভব। তাই সর্বাধিনায়কত্বটাকেও গ্রহণযোগ্য করে তোলার জন্য দল গোষ্ঠী এবং গণতন্ত্রকে একেবারে নস্যাৎ করা অসম্ভব। এক কথায়, ধর্মীয় পুনরুভ্যুত্থানবাদের হাত ধরে এই গণতন্ত্রের মাধ্যমেই 'সন্ত্রাস'কে আইনী করে তারা ক্ষমতায় আসছে। এটা ডান এবং বামে দুটো দিক থেকেই আসছে। বিপদটা তাই আরও বেশি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~